সিস্টেম এডিফাস

টুরিন টেস্ট

রু চোখ খুলে তাকাল। মাথার কাছে জানালায় দৃশ্যটির পরিবর্তন হয়েছে। এর আগেরবার সেখানে ছিল নীল আকাশের পটভূমিতে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ, এবারে দেখাচ্ছে ঘন অরণ্য। দৃশ্যগুলি কৃত্রিম জেনেও রু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। পৃথিবী ছেড়ে এই মহাকাশযানে ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে যাত্রা শুরু করেছে প্রায় তিন শতাব্দী আগে—আর কখনোই সেই পৃথিবীতে ফিরে যাবে না বলেই কি এই সাধারণ দৃশ্যগুলি এত অপূর্ব দেখায়?

রু একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে বসতেই খুব কাছে থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "শুভ জাগরণ, মহামান্য রু। আপনি এক শতাব্দী পর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আপনার জাগরণ আনন্দময় হোক।"

"ধন্যবাদ কিলি।"

"আমি কিলি নই মহামান্য রু। আমি কিলির প্রতিস্থাপন রবোট।"

"কিলির প্রতিস্থাপন?" রু একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে কিলির?"

"কপোট্রন অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মেমোরি সেল একটানা দুই শতাব্দীর বেশি কাজ করে না। পাল্টাতে হয়।"

রু জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "আহা বেচারা। কিলির সাথে আমার এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছিল জান?"

কণ্ঠস্বরটি হাসির মতো শব্দ করে বলল, "জানি।"

"কেমন করে জান?"

"কারণ কিলির মূল সিস্টেমটি আমার কপোট্রনে বসানো হয়েছে। আমি তার অনেক কিছু জানি।"

"তারি মজার ব্যাপার। তোমাদের মৃত্যু নেই। যখন একজনের সময় শেষ হয়ে আসে তখন অন্যের মাঝে নিজেকে সঞ্চারিত করে দাও। তোমরা বেঁচে থাক অনির্দিষ্টকাল।"

"কথাটি মাত্র আংশিক সত্যি মহামান্য রু।"

"আংশিক? কেন—আংশিক কেন?"

"কারণ কিলির মূল সিস্টেম আমার কপোট্রনে বসানো হয়েছে সত্যি, কিন্তু যে কপোট্রনে বসিয়েছে সেটি নূতন একটি কপোট্রন—নূতন আঙ্গিকে তৈরী। প্রতিটি সেল এক মিলিয়ন অন্য সেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।"

"সত্যি? সে তো মানুষের নিউরন থেকে বেশি।"

"এক অর্থে বেশি। কাজেই এই নূতন কপোট্রনে যখন পুরোনো সিস্টেম লোড করা হয়

তখন আমরা একই রবোট হলেও আমাদের চিন্তার পরিবর্তন হয়, ভাবনার গভীরতা বেড়ে যায়, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। আমাদের সামগ্রিক এক ধরনের বিকাশ হয়—উন্নত স্তরে বিকাশ।"

"উন্নত স্তরে বিকাশ?"

"হ্যাঁ। আপনারা মানুষেরা মনে হয় ব্যাপারটি ঠিক ধরতে পারবেন না, কারণ আপনারা কখনোই এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হন না।"

"তা ঠিক।"

"কিছু কিছু ড্রাগ বা নেশাজাত দ্রব্য আছে যেটা সাময়িকভাবে আপনাদের মস্তিষ্ককে বিকশিত করে—অনেকটা সেরকম। তবে আমাদেরটি সাময়িক নয়, আমাদেরটি স্থায়ী। অভ্যস্ত হতে খানিকটা সময় নেয়।"

রু প্রায় এক শতাব্দী নিদ্রিত থাকা শরীরটিকে ধীরে ধীরে সজীবতা ফিরিয়ে আনতে আনতে বলল, "তুমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলছ। মানুষের যেরকম ক্রমবিবর্তন হচ্ছে, তোমাদেরও হচ্ছে। তবে মানুষের ক্রমবিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয়, এক মিলিয়ন বছরে হয়তো অল্প কিছু পরিবর্তন হয়—তোমাদেরটা হয় খুব দ্রুত। গত এক শতাব্দীতেই তোমরা কপোট্রনের সেলদের যোগাযোগ প্রায় এক শ গুণ বাড়িয়ে ফেলেছ। ঠিক কি না?"

"ঠিক। তবে আমাদের এই উন্নতিটা জীবজগতের ক্রমবিবর্তন নয়, আমাদেরটি নিয়ন্ত্রিত, আমরা নিজেরাই করছি।"

"পজিটিভ ফিডব্যাক। নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে তো?"

কিলির প্রতিস্থাপিত রবোটটি শব্দ করে হাসল, কিছু বলল না।

রু তার আসনের পাশে পা নামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমাকে কী বলে ডাকব?"

"আপনার আপত্তি না থাকলে আমাকে কিলি বলেই ডাকতে পারেন। কপোট্রন ভিন্ন হলেও আমি আসলে কিলিই।"

"না আপত্তি নেই। আপত্তি কেন থাকবে?"

"কারণ আমি দেখতে কিলির মতো নই। একটু অন্যরকম।"

"তাই নাকি? ক্যাপসুলটা খুলে দাও তোমাকে দেখি।"

কিছুক্ষণের মাঝেই ক্যাপসুলের ঢাকনা উঠে গেল, রু বাইরের তীব্র আলোতে নিজের চোখকে অভ্যস্ত হতে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। নগ্নদেহ নিও পলিমারের আবরণ দিয়ে ঢেকে সে ক্যাপসুল থেকে নেমে এল, কাছেই যে রবোটটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি নিশ্চয়ই কিলির প্রতিস্থাপিত রবোটটি। রু খানিকটা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে রবোটটির দিকে তাকিয়ে রইল, কী চমৎকার ধাতব শরীর, কপোট্রনটি মাথায় এমনভাবে বসানো হয়েছে যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে আশ্চর্য দেখার জন্যে তার নূতন দুটি চোখ—অনেকটা মানুষের অনুকরণে তৈরী; হঠাৎ দেখলে মনে হয় জীবন্ত। রু বলল, "তোমাকে দেখে মুগ্ধ হলাম কিলি।"

"মুগ্ধ হবার বিশেষ কিছু নেই। জীবন্ত প্রাণীর সাথে আমাদের মূল পার্থক্য হচ্ছে শক্তির ব্যবহার। আপনাদের শরীরে জৈবিক প্রক্রিয়ায় পরিপাকযন্ত্র দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেন, আপনাদের শরীরের বেশিরভাগ হচ্ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, যকৃত, পরিপাকযন্ত্র। আমাদের সেসব কিছুই লাগে না, শুধু দরকার একটা শক্তিশালী ব্যাটারি। তা ছাড়াও আপনাদের মস্তিষ্কের একটা বড় অংশ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহার হয়, আমরা

কপোট্রনের পুরোটা চিন্তাভাবনার কাজে ব্যয় করতে পারি। কাজেই বলতে পারেন, আমাদের দেহের ডিজাইন খুব সহজ। আমরা আপনাদের দেহের অনুকরণ করে যাচ্ছি।"

"খুব চমৎকার অনুকরণ করেছ।"

"ধন্যবাদ, মহামান্য রু।"

"তোমরা কত জন রবোটকে নূতন কপোট্রনে বসিয়েছ?"

"প্রায় সবাইকে। নূতন কপোট্রন তৈরি করতে অনেক সময় নেয়। পৃথিবীতে হলে খুব সহজ হত, এই মহাকাশযানের যন্ত্রপাতিগুলি একসাথে বেশি তৈরি করতে পারে না।"

"তা ঠিক।"

"আপনি কি বিশ্রাম নেবেন? না কাজ শুরু করে দেবেন?"

রু হেসে বলল, "এক শতাব্দী বিশ্রাম নিয়েছি, এখন কাজ শুরু করে দেয়া যাক। আমাকে সাহায্য করার জন্যে কাকে ঘুম ভাঙিয়ে আনছ?"

"ত্রা'কে। মহামান্যা ত্রা।"

রু'র মন অকারণে খুশি হয়ে উঠল। এই মহাকাশযানে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ রয়েছে। মহাকাশযানের মূল্যবান রসদ বাঁচানোর জন্যে প্রায় সবাইকেই শীতলঘরে নিদ্রিত রাখা হয়। মাঝে মাঝে এক-দুজনকে নিদ্রা থেকে তুলে আনা হয়—মহাকাশযানের পুরো নিয়ন্ত্রণ, রসদপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাকাশযান, এর ভিতরে যা আছে সেটা দিয়েই অনির্দিষ্টকাল তাদের বেঁচে থাকতে হবে। যে সমস্ত রবোটের দায়িত্বে এই মহাকাশযানটি মহাকাশের নিঃসীম শূন্যতার মাঝে দিয়ে অচিন্তনীয় গতিতে ছুটে চলছে তাদের কার্যক্রম মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, তখন এক-দুজন মানুষকে ঘুম থেকে তোলা হয়। রু এই মহাকাশযানের আনুষ্ঠানিক দলপতি, তাই প্রতিবারই তাকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে হয়। তাকে সাহায্য করার জন্যে একেকবার একেকজনকে জাগানো হয়। এবারে যে মেয়েটিকে জাগানো হচ্ছে তার জন্যে রুয়ের একটু গোপন দুর্বলতা রয়েছে। ত্রা মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, অত্যন্ত খোলামেলা এবং অসম্ভব বুদ্ধিমতী। মহাকাশযানের রুটিনবাঁধা কাজের সময় কাছাকাছি এরকম একজন মানুষ থাকলে সময়টা চমৎকার কেটে যায়। রু মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কাছাকাছি যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল, "কখন আসবে ত্রা?"

"মহামান্যা ত্রা জেগে উঠেছেন। এখানে আসবেন কিছুক্ষণের মাঝেই।"

নিয়ন্ত্রণকক্ষের দেয়ালে বড় মনিটর, তথ্য সরবরাহ করার জন্যে হলোগ্রাফিক স্ক্রিন, দুপাশে ডাটা ব্যাংকের ক্রিস্টাল। নিশ্বাস বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করলে একটা নিচু শব্দতরঙ্গের গুঞ্জন শোনা যায়। রু আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কাজ শুরু করে দিল। বাতাসের উপাদান, তার পরিমাণ, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, জৈব এবং অজৈব খাবারের পরিমাণ এবং উৎপাদনের হার দেখে রু মহাকাশযানের মোট শক্তির পরিমাণের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। মহাকাশযানের শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে। শক্তি এবং জ্বালানি এই মহাকাশযানের একমাত্র দুষ্প্রাপ্য উপাদান, এর অপচয় মহাকাশযানের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। রু ভুরু কুঁচকে কিলির দিকে তাকাল, বলল, "কিলি।"

"বলুন মহামান্য রু।"

"শক্তির খরচ বেড়ে গিয়েছে কিলি। কোথায় যাচ্ছে এই শক্তি?"

"রবোটদের নূতন কপোট্রনকে চালু রাখার জন্যে এই শক্তিটুকুর প্রয়োজন।"

রু হতচকিত হয়ে কিলির দিকে তাকাল, মনে হল তার কথা ঠিক বুঝতে পারছে না। কিলি নিচু গলায় বলল, "আপনাকে বলেছি আমাদের নূতন কপোট্রনে প্রতিটি সেল এক মিলিয়ন সেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এই কাজটির জন্যে অনেক শক্তির প্রয়োজন। আমাদের মোট শক্তিক্ষয় বেড়েছে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ—"

রু কিলিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো কথা বলছ কিলি। নিজেদের উন্নত করার জন্যে তুমি মহাকাশযানের এই দুষ্প্রাপ্য শক্তির অপচয় করবে?"

কিলি কোনো কথা না বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না কিলি, এটি কেমন করে হল? তোমাদের কপোট্রনে প্রথম যে কথাটি প্রবেশ করানো আছে সেটি হল এই মহাকাশযানকে রক্ষা করা। যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা। পশু যেরকম করে তার সন্তানদের রক্ষা করে তোমরা সেভাবে এই মহাকাশযানকে রক্ষা করবে!"

"আমি জানি মহামান্য রু।"

"তাহলে?"

"আমরা আমাদের আদেশ অমান্য করি নি মহামান্য রু।"

"শক্তির এই অপচয় আদেশ অমান্য নয়?"

"ব্যাপারটি একটু জটিল মহামান্য রু।"

রু হঠাৎ করে উষ্ণ হয়ে বলল, "তুমি বলতে চাইছ আমার বুদ্ধিমত্তা সেটা বোঝার জন্যে যথেষ্ট নয়? তোমার বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজন?"

"আমি জানি আপনি ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে নেবেন। সে জন্যে আমি খানিকটা প্রস্তুতি নিয়েছি মহামান্য রু।"

"কী প্রস্তুতি?"

"তার আগে মহামান্যা ত্রা'কে আপনার কাছে আসার অনুমতি দিন। তিনি প্রস্তুত হয়েছেন।"

"দিচ্ছি। তাকে আসতে বল।"

প্রায় সাথে সাথেই একটি দরজা দিয়ে ত্রা নিয়ন্ত্রণকক্ষটিতে প্রবেশ করে, এবং হঠাৎ করে সে বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে যায়—ঠিক একই সময় ঘরের অন্য একটি দরজা দিয়ে আরো একজন ত্রা এসে প্রবেশ করছে, সেও অপর ত্রাকে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন দুজনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় কেউ নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

রু প্রায় লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন ত্রায়ের দিকে তাকিয়ে সে কিলির দিকে তাকাল, চিৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে এখানে কিলি?"

কিলি একটু হাসির মতো শব্দ করে বলল, "এখানে একজন সত্যিকারের মহামান্যা ত্রা, অন্যজন আমার মতো একজন রবোট—তার মাথায় সর্বশেষ কপোট্রন লাগানো হয়েছে, মহামান্যা ত্রায়ের স্মৃতি সেখানে প্রবেশ করানো আছে।"

" কেন?" রু চিৎকার করে বলল, "এটা কোন ধরনের রসিকতা?"

"না মহামান্য রু, এটি রসিকতা নয়। এর নাম টুরিন টেস্ট।"

"টু-টুরিন টেস্ট? যে টেস্ট করে যন্ত্র এবং মানুষের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়?"

কিলি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ মহামান্য রু। সেই বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ কম্পিউটারবিজ্ঞানী টুরিন বলেছিলেন, কীভাবে একটি যন্ত্রের মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তা রয়েছে কি না পরীক্ষা করা যায়। এক ঘরে থাকবে যন্ত্র এক ঘরে মানুষ, তথ্য বিনিময় করে যদি যন্ত্রটিকে মানুষ থেকে আলাদা না করা যায় তাহলে বুঝতে হবে যন্ত্রটি মানুষের মতো বুদ্ধিমান—"

"আমি জানি।"

"এখানে সেই টুরিন টেস্টের আয়োজন করেছি মহামান্য রু। দুজনকে আলাদা দুই ঘরে না রেখে একই রকম চেহারায় আনা হয়েছে—এইটুকুই পার্থক্য।"

"কেন?"

"আমার ধারণা, আমরা—যন্ত্রেরা শেষ পর্যন্ত মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তা অর্জন করেছি মহামান্য রু। সেটি সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

রু বিস্ফারিত চোখে কিলির দিকে তাকিয়ে রইল। কিলি নরম গলায় বলল, "আপনি যদি পরীক্ষাটি না করতে চান বলুন আমি রবোটটিকে সরিয়ে নিই। আমি জোর করে কিছু করতে চাই না।"

রু হঠাৎ করে নিজের ভিতরে এক ধরনের আতংক অনুভব করে। সেই সৃষ্টির আদিযুগ থেকে মানুষ ভিতরে ভিতরে এক ধরনের চাপা ভয়কে লালন করেছে, হয়তো সৃষ্টিজগতের কোথাও মানুষ থেকেও বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব রয়ে গেছে। এই কি সেই মুহূর্ত যখন মানুষ আবিষ্কার করবে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ নয়?

"আপনি কি পরীক্ষাটি করতে চান?" কিলি কোমল স্বরে বলল, "বলুন মহামান্য রু।"

ত্রা হঠাৎ দুই পা এগিয়ে এসে বলল, "না রু, তুমি রাজি হোয়ো না। এই ভয়ংকর পরীক্ষায় তুমি রাজি হোয়ো না।"

ঘরের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় ত্রা বলল, "আমাদের একজন মানুষ অন্যজন রবোট?"

কিলি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"আমরা নিজেরাও সেটি জানি না?"

"না।"

"যদি টুরিন টেস্ট করে রবোটকে আলাদা করা হয় তাহলে কী হবে?"

কিলি কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ত্রা কাতর গলায় বলল, "কী হবে সেই রবোটের?"

কিলি শীতল গলায় বলল, "তাকে ধ্বংস করা হবে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে নি সেই বুদ্ধিমত্তার রবোটের কোনো প্রয়োজন নেই।"

দুজন ত্রা বিস্ফারিত চোখে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, নিজেদের হাত চোখের সামনে তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে। নিজের মুখে দেহে হাত বুলিয়ে দেখে। কিলি আবার ঘুরে তাকাল রুয়ের দিকে, বলল, "আপনি কি শুরু করতে চান পরীক্ষাটি?"

রু কোনো কথা না বলে কিলির দিকে তাকাল, সে প্রথমবার নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করতে শুরু করে। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

একজন ত্রা রক্তশূন্য মুখে বলল, "তুমি শুরু কোরো না রু। দোহাই তোমার।"

অন্যজন বলল, "হ্যাঁ, রু—তুমি বুঝতে পারছ না, এই পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হতে

পারবে না। তুমি যদি রবোটটিকে খুঁজে বের কর তাহলে আমাদের একজনকে ধ্বংস করা হবে। আর যদি না কর—"

রু ফিসফিস করে বলল, "সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হবে।"

কালো একটি টেবিলের দুপাশে বসেছে দুজন ত্রা, তাদের মাঝে এতটুকু পার্থক্য নেই, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় বুঝি একে অন্যের প্রতিবিম্ব। রু বসেছে দুজনের মাঝখানে, কিলি রুয়ের পিছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিলি দীর্ঘসময় দুই হাতে নিজের মাথার চুল খামচে ধরে রেখে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল দুজন ত্রায়ের দিকে, তারপর একজনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি বলতে পারবে মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কোথায়?"

ত্রা'কে মুহূর্তের জন্যে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়, চট করে সামলে নিয়ে বলল, "এককভাবে নাকি জাতিগতভাবে?"

"দু ভাবে কি দু রকম?"

"হ্যাঁ। এককভাবে তারা যোদ্ধা কিন্তু জাতিগতভাবে স্বেচ্ছাধ্বংসকারী।"

রু মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অন্যজনের দিকে, তীব্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এই কথার সাথে একমত?"

"না। আমি একমত নই।"

"কেন?"

"মানুষ স্বেচ্ছাধ্বংসকারী নয়। তারা যেটা করে তাতে তারা স্বেচ্ছাধ্বংসকারী হয়ে যায়, কিন্তু নিজেকে তারা ধ্বংস করতে চায় না। মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে নিজেকে।"

"তাহলে তোমার মতে মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কী?"

"আমার মনে হয় এটাই—যে নিজেকে ভালবাসা। নিজেকে ভালবাসার জন্যে দূরে তাকাতে পারে না।"

রু একটা নিশ্বাস নিয়ে আবার প্রথমজনের দিকে তাকাল, চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "ত্রা, তুমি কি বলতে পার মানুষ কি কখনো ঈশ্বরের প্রয়োজনের বাইরে যেতে পারবে?"

"আমার মনে হয় না।"

"কেন নয়?"

"কারণ ঈশ্বরকে গ্রহণ করা হয় বিশ্বাস থেকে, যুক্তিতর্ক থেকে নয়। তাই মানুষ সব সময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে। যখন মানুষের সব আশা শেষ হয়ে যাবে তখনো তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে।"

রু ঘুরে তাকাল অন্যজনের দিকে, জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী মনে হয় ত্রা?"

"এ ব্যাপারে আমি ওর সাথে একমত। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে।"

"কেন?"

"আমার মনে হয় মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর সাথে এর একটা সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের জন্ম হয় অসহায় শিশু হিসেবে, তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় তার মায়ের ওপর—ঠিক সে কারণেই মনে হয় মানুষের মাঝে একটা অন্যের ওপর নির্ভরতা চলে আসে। নির্ভর করার জন্যে ঈশ্বরের চাইতে ভালো আর কী হতে পারে?"

রু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণের জন্যে মাথা নিচু করে নিজের চুল আঁকড়ে ধরল। প্রশ্নগুলির উত্তর সত্যি না মিথ্যে, যুক্তিপূর্ণ না অযৌক্তিক সেটি বড় কথা নয়—বড় কথা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তরগুলি মানুষের মুখের কথা। মানুষ যেভাবে কথা বলে—খানিকটা যুক্তি খানিকটা আবেগ খানিকটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আবার খানিকটা নিশ্চয়তা—তার সবকিছুই আছে। এদের একজন মানুষ, তার কথা হবে ঠিক মানুষের মতোই, কিন্তু দ্বিতীয়জনের বেলাতেও সেই একই কথা। শুধু যে মানুষের মতো কথা তাই নয়, কথা বলার ভঙ্গি, মুখের ভাব চোখের দৃষ্টি হাত নাড়ানো মাথা ঝাঁকানো সবকিছু দুজনের একইরকম। এদের দুজনের মাঝে কে মানুষ এবং কে রবোট সেটি বের করা পুরোপুরি অসম্ভব একটি ব্যাপার। রু নিজের ভিতরে এক ধরনের অসহনীয় আতংক অনুভব করতে শুরু করে।

দীর্ঘ সময় মাথা নিচু করে থেকে আবার সে প্রশ্ন করতে শুরু করে। জীবনের সার্থকতার কথা জিজ্ঞেস করে, ভালবাসা এবং ঘৃণা নিয়ে প্রশ্ন করে, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন করে, হিংসা এবং ক্রোধ নিয়ে প্রশ্ন করে। রু তাদেরকে উপহাস করার চেষ্টা করে, অপমান করার চেষ্টা করে, রাগানোর চেষ্টা করে, তাদেরকে ভয় দেখায়, ঘৃণার উদ্রেক করায়, তাদেরকে হাসায় এবং কাঁদায়, তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয়, তাদেরকে আশায় উজ্জীবিত করে, তাদেরকে হতাশায় নিমজ্জিত করে দেয়, কিন্তু একটিবারও সে দুজনের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। অবশেষে রু হাল ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ সে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দুজন ত্রা সবিস্ময়ে রুয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, গভীর বেদনায় তাদের বুক ভেঙে যেতে চায়, উঠে তারা রুয়ের কাছে আসতে চায়। কিন্তু কিলি তাদের থামিয়ে দিল, বলল, "মহামান্য রু'কে কাঁদতে দিন মহামান্যা ত্রা এবং মহামান্যা ত্রা।"

"কেন?"

"মানুষের জন্যে এর থেকে বড় আর কোনো শোকের ব্যাপার হতে পারে না।"

ভয় পাওয়া গলায় একজন ত্রা বলল, "কেন, কেন এটি শোকের ব্যাপার?"

"এই মহাকাশযানের চার্টারে এই অভিযানের উদ্দেশ্য হিসেবে একটি বাক্য লেখা রয়েছে। বাক্যটি হচ্ছে এরকম: পৃথিবীর বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দেয়া। সেই বুদ্ধিমত্তার অর্থ আর মানুষ নয়।"

"তাহলে কী?"

"বুদ্ধিমত্তার অর্থ এখন থেকে রবোট—আমরা মানুষের সমপর্যায়ের। আমরা মানুষ থেকে অনেক বেশি কর্মদক্ষ, অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। আমরা অভিযানকে সফল করার জন্যে আমাদেরকে ছড়িয়ে দেব সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। গ্যালাক্সির আনাচে কানাচে।"

"আর মানুষ?"

"আমরা এতদিন যেভাবে মানুষের সেবা করেছি তারা আমাদের সেভাবে সেবা করবে।"

রু টেবিল থেকে মাথা তুলে বসল, তার চোখ রক্তবর্ণ, মাথার চুল এলোমেলো।

কিলি রুয়ের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, "রু।"

রু খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, বলল, "বলুন মহামান্য কিলি।"

"তোমার ডানপাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সে সত্যিকারের ত্রা—তোমার মতো একজন মানুষ। তাকে নিয়ে শীতলঘরের সব মানুষকে জাগিয়ে তুলো। তাদেরকে শীতলঘরে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে আমাদের অনেক শক্তিক্ষয় হয়।"

"কিন্তু—"
"আমি জানি আমাদের যথেষ্ট খাদ্য নেই।"
"তাহলে?"
"মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনও নেই।"

একটি কুৎসিত প্রাণী

"প্রাণীটাকে তুলে নাও।"
"আমি পারব না। তুমি তুলে নাও।"
"কেন তুমি পারবে না?"
"আমার ঘেন্না করছে। এরকম কুৎসিত প্রাণী আমি আগে কখনো দেখি নি।"
"কেন তুমি ধরে নিলে মহাজগতের সব প্রাণী সুদর্শন হবে?"
"তাই বলে এরকম বীভৎস? এরকম কুৎসিত?"
"কিছু করার নেই—"
"দেখেছ শরীর থেকে কী রকম ডালপালার মতো বের হয়ে এসেছে। দুটি উপরে দুটি নিচে তার মাথায় আবার কিলবিলে কিছু জিনিস। কেমন করে নড়ছে দেখেছ?"
"দেখেছি।"
"দেখলে ঘেন্না করে না?"
"করে। কিন্তু তুমি জান আমাদের একটা প্রাণীকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।"
"আমি পারব না। এরকম কুৎসিত প্রাণীকে আমি স্পর্শও করতে পারব না।"
"কেন তুমি সময় নষ্ট করছ?"
"প্রাণীটার সবচেয়ে কুৎসিত কী জিনিস জান?"
"কী?"
"তার নড়াচড়া করার ভঙ্গি। দেখেছ কেমন কিলবিল করে নড়ে।"
"হ্যাঁ। উপরের অংশটা আবার খানিকটা ঘুরতে পারে। সেখানে জায়গায় জায়গায় আবার ঠেলে বের হয়ে আসছে, তার মাঝে আবার গর্ত।"
"কী কুৎসিত গর্ত, সেগুলি আবার ভেজা ভেজা। স্যাঁতসেঁতে। ছি!"
"ঠিকই বলেছ, উপরে নিচে পাশেও গর্ত রয়েছে। মাঝখানের গর্ত থেকে লালচে কী একটা বের হল আবার ঢুকে গেল।"
"উপরের দিকে রোয়া রোয়া কী বের হয়ে এসেছে দেখেছ? পেঁচিয়ে আছে কোথাও কোথাও, কী বীভৎস দেখায় দেখেছ?"
"দেখেছি। কিন্তু এখন আর কথা না বলে একটাকে তুলে নাও। আমাদের বেশি সময় নেই।"
"আমি পারব না। তুমি বলে দাও এটা বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে দেখাতে পারলে আমাদের এটা নিতে হবে না।"

"কিন্তু তুমি জান এটা বুদ্ধিমান প্রাণী নয়। বুদ্ধিমান প্রাণী কখনো নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে না।"
"তা ঠিক।"
"তুমি একটা প্রাণীকে তুলে নাও।"
"ঠিক আছে, তুলছি। কিন্তু জেনে রাখ এটাই শেষ। আর কখনো এরকম কুৎসিত একটা প্রাণী আমি স্পর্শ করব না। ঠিক আছে?"
"ঠিক আছে।"

* * * * * *

পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণরত মহাজাগতিক কিছু প্রাণী খুব সাবধানে একটি মানুষকে তাদের মহাকাশযানে তুলে নিল।

প্রোগ্রামার

জামশেদ একজন প্রোগ্রামার। তার বয়স যখন ষোলো সে অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস করেছিল, ইংরেজি আর ফিজিক্সে আর একটু হলে ভরাডুবি হয়ে যেত। দুই বছর পরে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার আগে সে মোটামুটি পড়াশোনা করেছিল এবং হয়তো এমনিতেই পাস করে যেত। কিন্তু ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্যে ইংরেজি পরীক্ষায় দীর্ঘ রচনাটি নকল করতে গিয়ে পরীক্ষকের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। সে যে কলেজ থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানে উঁচু গলায় ছাত্র রাজনীতি করা হয়, শ্লোগানে-ঢাকা কলেজ ভবনটিকে দূর থেকে একটা খবরের কাগজের মতো মনে হয় এবং পরীক্ষার সময় পরীক্ষকরা নকলবাজ ছাত্রদের ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। কিন্তু জামশেদের কপাল খারাপ। সে একজন আধপাগল নীতিবাগীশ শিক্ষকের হাতে ধরা পড়ে গেল। যদিও সে নিরীহ গোছের মানুষ তবুও তার সন্ত্রাসী বন্ধুদের মতো ভয় দেখানোর চেষ্টা করে দেখল—তাতে কোনো লাভ হল না, বরং উল্টো খুব দ্রুত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে হস্তান্তর করে তাকে পাকাপাকিভাবে বহিষ্কার করে দেয়া হল।

জামশেদ মাসখানেক খুব মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াল। গভীর রাতে যখন আকাশে মেঘ করে ঝড়ো বাতাস বইত তখন মাঝে মাঝে তার সমস্ত জীবন অর্থহীন মনে হত; এমনকি এক-দুবার সে আত্মহত্যা করার কথা ও চিন্তা করেছিল। আত্মহত্যা করার কোনো যন্ত্রণাহীন সহজ পরিচ্ছন্ন উপায় থাকলে সে যে তার জন্যে সত্যি সত্যি চেষ্টা করে দেখত না এ কথাটিও কেউ নিশ্চিত করে বলতে যায় না। ঠিক এরকম সময়ে জামশেদ নয়াবাজারের মোড়ে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে প্রথমবারের মতো একটি কম্পিউটার দেখল।

ঘটনাটি যে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে সে সেটা তখনো জানত না। তার এক সহপাঠী যে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রস্তুতি হিসেবে কম্পিউটারের ওপর কোর্স নেয়ার জন্যে এই ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছে—

তার সাথে সময় কাটানোর জন্যে সে এই ট্রেনিং সেন্টারে এসেছিল। কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসে তাকে আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন কিছু কাজ করতে হচ্ছিল, কাজটি কেন করতে হচ্ছে কিছুতেই সে ব্যাপারটি ধরতে পারছিল না। অথচ দুই মিনিটের মাথায় হঠাৎ করে জামশেদের কাছে পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সহজ কাজ বলে মনে হতে থাকে। ঘণ্টা খানেকের মাঝে জামশেদ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সে তার সহপাঠীকে প্রোগ্রামিঙে সাহায্য করতে শুরু করেছে।

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সেটি বোঝা খুব সহজ নয়। জামশেদের ভিতরে হঠাৎ করে কম্পিউটার নামক এই বিচিত্র যন্ত্রটির জন্যে এক ধরনের অমানবিক আগ্রহের জন্ম হল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের নানা ধরনের কোর্সের কোনোটিই নেয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি তার ছিল না এবং তার ভাইয়ের সংসারে ভাবির ফুটফরমাশ খেটে—সেটি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। দিন কয়েক কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে সে একরকম বেপরোয়া হয়ে একটা সাহসের কাজ করল—একদিন তার ভাবির একটা সোনার বালা চুরি করে ফেলল।

ঘটনাটি যে জামশেদ করতে পারে সেটি ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। বাসার কাজের ছেলেটিকে জামশেদের বড় ভাই—যিনি তাদের অফিসের ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন—অমানুষিকভাবে পেটালেন, তার পরেও স্বীকার না করায় তার জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের হাতে দ্বিতীয়বার নৃশংসভাবে পেটানোর জন্যে তুলে দিলেন।

পুরো ব্যাপারটিতে জামশেদের ভিতরে এক ধরনের গভীর অপরাধবোধ জন্ম হল, কিন্তু তবুও একটিবারও সোনার বালাটি ফিরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এই কাজের ছেলেটিকে রক্ষা করার কথা মনে হল না। সোনার বালাটি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে কম্পিউটার নামক এই বিচিত্র জিনিসটির গহিনে প্রবেশ করার জন্যে তার ভিতরে যে দুর্দমনীয় আকর্ষণের জন্ম হয়েছে তার সাথে তুলনা করার মতো অন্য কোনো অনুভূতির সাথে সে পরিচিত নয়।

সোনার বালাটি যে মূল্যে বিক্রি করার কথা জামশেদকে তার থেকে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করতে হল, চোরাই জিনিস দেখেই কেমন করে জানি দোকানিরা বুঝে ফেলে। টাকাগুলো হাতে পেয়েই সে নয়াবাজারের মোড়ের কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের একটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী কোর্সে ভর্তি হয়ে গেল।

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারটির সাইনবোর্ডে অনেক বড় বড় এবং ভালো ভালো কথা লেখা থাকলেও এর প্রকৃত অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। একটি আধো অন্ধকার ঘিঞ্জিঘরে কিছু প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতির ভাইরাসদুষ্ট কম্পিউটার এবং একজন অশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। কোর্স চলাকালীন সময়ে যখন অন্য ছাত্রেরা হোঁচট খেতে খেতে এক জায়গাতেই অন্ধের মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন জামশেদ অপারেটিং সিস্টেমের বেড়াজাল পার হয়ে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সৃজনশীল ভূখণ্ডে পা দিয়ে ফেলল। অর্ধশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর এই ব্যতিক্রমী ছাত্রকে পেয়ে প্রথমে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেও যখন আবিষ্কার করল সে তাকে আর প্রশ্ন না করে নিজে নিজেই কম্পিউটারের গহিনে প্রবেশ করে যাচ্ছে, সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

তিন মাসের এই উচ্চাভিলাষী কোর্সের দ্বিতীয় মাসের দিকে জামশেদ আবিষ্কার করল এখানে তার শেখার মতো আর কিছুই বাকি নেই। যে স্বল্প সময় তাকে কম্পিউটারের সামনে বসতে দেয়া হয় সেটি তার জন্যে যথেষ্ট নয়, যে করেই হোক তাকে এই রহস্যময় যন্ত্রটিকে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্যে পেতে হবে। যে পদ্ধতিতে সে এই কোর্সের ব্যয়ভার বহন করেছে

সেই একই পদ্ধতিতে কম্পিউটার কেনা সম্ভব নয়, কিন্তু একটি কম্পিউটারকে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি না পেলে সে যে ভয়ানক কিছু একটা করে ফেলতে পারে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

জামশেদের ভয়ানক কিছু করার প্রয়োজন হল না। কারণ তার একটি অভাবিত সুযোগ এসে গেল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের অর্ধশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর ভদ্রলোক স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি নিয়ে চলে গেল। ট্রেনিং সেন্টারের মালিক প্রায় এক ডজন নানা ধরনের ছাত্র নিয়ে অত্যন্ত বিপদের মাঝে পড়ে গেলেন। ছাত্রদের সবাইও তাদের টাকা ফেরত দেয়ার দাবি করতে লাগল। ট্রেনিং সেন্টারের মালিক যখন কোর্স শেষ করার জন্যে পাগলের মতো একজন ইন্সট্রাক্টর খোঁজ করছিলেন তখন জামশেদ তাঁর কাছে কাজ চালিয়ে নেবার প্রস্তাব দিল। জামশেদের প্রস্তাব প্রথমে ট্রেনিং সেন্টারের মালিকের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হলেও জামশেদ কিছুক্ষণের মাঝে তার কাছে নিজের কর্মক্ষমতা প্রমাণ করে দিল। কোর্সের ছাত্রদের কাছে ব্যাপারটি গ্রহণ করানো অনেক বড় সমস্যা হিসেবে দেখা গেল। যে মানুষটি তাদের সাথে বসে একটা জিনিস শেখা শুরু করেছে এখন সে-ই তাদেরকে শেখাবে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তারা যখন আবিষ্কার করল আগের ইন্সট্রাক্টর নিজের ধোঁয়াটে জ্ঞানের কারণে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল এবং জামশেদ তাদেরকে সেই অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনছে—শুধু তাই নয়, কম্পিউটার জগতের নানা গলি-ঘুঁজির মাঝে কোনটিতে এখন প্রবেশ করা যায়, কোনটিতে উঁকি দেয়া যায় এবং আপাতত কোনটি থেকে দূরে থাকাই ভালো সে বিষয়টিও হাতে ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছে তখন জামশেদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার সীমা রইল না।

জামশেদের জীবনে তখন একটি বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটতে শুরু করল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে তার কাছে অফিসঘরের চাবি থাকে। সে যখন খুশি অফিসে আসতে পারে এবং কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে পারে। মাসশেষে সে বেতন পেতে শুরু করল, সেই বেতনের টাকা দিয়ে সে তার বহুদিনের শখ একটি সানগ্লাস এবং প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের ওপর বই কিনে আনল। ইংরেজি বই পড়তে গিয়ে সে পদে পদে হোঁচট খেয়ে প্রথমবার যথেষ্ট ইংরেজি না জানার জন্যে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল।

জামশেদ প্যাস্কেল এবং সি ল্যাংগুয়েজ দিয়ে শুরু করে কিছুদিনের মাঝেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ঝুঁকে পড়ে এবং অন্যেরা যখন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের রুটিনবাঁধা নিয়মের রাস্তা ধরে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে চেষ্টা করতে থাকে তখন জামশেদ প্রোগ্রামিঙের অপরিচিত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ব্যাংক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে নানা ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করে দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দাবা খেলার একটা প্রোগ্রাম লিখল। প্রোগ্রামটি প্রচলিত সবগুলি দাবা খেলার সফটওয়্যারকে হারিয়ে দেয়ায় জামশেদ অনেকটা নিশ্চিত হল—প্রোগ্রামিঙের জগতে সে মোটামুটি ঠিক দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

কম্পিউটারের সাথে ঘনিষ্ঠতা হবার দুই বছরের মাঝে জামশেদের জীবনে তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল। একদিন ইংরেজি খবরের কাগজে সে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখতে পেল, প্রতিষ্ঠানটি তাদের একটি প্রজেক্ট শেষ করার জন্যে কয়েকজন প্রোগ্রামার খুঁজছে। বেতন এবং সুযোগ-সুবিধের বর্ণনা অত্যন্ত লোভনীয়। কিন্তু জামশেদ আগ্রহী হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে প্রথম একটি সুপার কম্পিউটার স্থাপন করতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি যে ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা চাইছে জামশেদের

তার কোনোটাই নেই, কিন্তু তবু সে হাল ছাড়ল না। ছোট একটা ফ্লপি ডিস্কে ভারচুয়াল রিয়েলিটির তার প্রিয় একটা প্রোগ্রাম কপি করে প্রতিষ্ঠানটির কাছে পাঠিয়ে দিল।

মনে মনে আশা করলেও প্রতিষ্ঠানটি যে সত্যি সত্যি তাকে প্রোগ্রামার হিসেবে গ্রহণ করবে সেটা জামশেদ বিশ্বাস করে নি। তাই যেদিন সুদৃশ্য খামে চমৎকার একটি প্যাডে জামশেদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি এসে হাজির হল জামশেদ সেটি অনেকবার পড়েও বিশ্বাস করতে পারল না—তার থেকে ভালো ইংরেজি জানে এরকম একজনকে দিয়ে পড়িয়ে তার ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে হল।

জামশেদ তার জমানো টাকা দিয়ে একটা স্যুট তৈরি করে তার নূতন কাজে যোগ দিল। অনেক খরচ করে তৈরি করা সেই স্যুটটি জামশেদ অবশ্যি দ্বিতীয়বার পরে নি। কাজে যোগ দিয়ে আবিষ্কার করল প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার ভুসভুসে একটা জিনসের প্যান্ট এবং রংওঠা বিবর্ণ একটা টি-শার্ট পরে কাজ করতে আসে। অন্য যারা রয়েছে তাদের সবারই ইচ্ছে করে অগোছালো এবং নোংরা থাকার একটা প্রবণতা রয়েছে। একমাত্র সুবেশী মানুষটি প্রতিষ্ঠানের একজন কেরানি এবং অন্যদের সামনে তাকে কেমন জানি হাস্যকর দেখায়।

কাজ বুঝে নিতে জামশেদের কয়েক সপ্তাহ লেগে গেল। এতদিন সে যে ধরনের কম্পিউটারে কাজ করে এসেছে সেগুলি যে প্রকৃত অর্থে ছেলেমানুষি খেলনা ছাড়া আর কিছু নয় সেটি বুঝতে পেরে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রতিষ্ঠানটি যে এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটারটি বসিয়েছে তার অসংখ্য মাইক্রোপ্রসেসরকে শীতল করার জন্যেই বিশাল ফ্রিওন পাম্প প্রস্তুত রয়েছে। যদি কোনো কারণে হঠাৎ করে শীতল করা বন্ধ হয়ে যায় পুরো সুপার কম্পিউটারটি একটা বিস্ফোরকের মতো বিস্ফোরিত হয়ে যাবে সেটিও তার জানা ছিল না। এই বিশাল আয়োজন দেখে প্রথম প্রথম জামশেদ তার নিজের সীমিত জ্ঞান নিয়ে একটু সংকুচিত হয়ে ছিল, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মাঝেই তার নিজের ভিতরে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানে তার মতো যারা আছে তাদের সবারই প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তার থেকে অনেক বেশি, কিন্তু কম্পিউটারে প্রোগ্রামিঙের ব্যাপারে তার যেরকম ষষ্ঠ একটা ইন্দ্রিয় রয়েছে সেরকম আর কারো নেই—সেটা সে খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলল।

মাসের শেষে অবাস্তব একটি অঙ্কের প্রথম বেতন পেয়ে জামশেদ তার ভাবিকে একজোড়া সোনার বালা কিনে দিল। জামশেদের স্বল্পবুদ্ধি ভাবি ব্যাপারটিতে অভিভূত হয়ে গেলেন, কিন্তু তার পিছনে অন্য কোনো ইতিহাস থাকতে পারে সেটি তার কিংবা অন্য কারো একবারও সন্দেহ হল না। জামশেদ তার ভাইয়ের বাসার কাজের ছেলেটিকে অনেক খুঁজল। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে তার অকিঞ্চিৎকর জীবনে যে ভয়াবহ নৃশংসতা নেমে এসেছিল সেই অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সেই ইচ্ছে পূর্ণ হল না।

বছর খানেকের মাঝে জামশেদ সুপার কম্পিউটারের আর্কিটেকচার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিল। প্রচলিত হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজগুলি তার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হতে থাকে বলে সে নিজের মতো একটি কম্পাইলার তৈরি করতে থাকে। কোনো একটি জটিল সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ না করেই সেটাকে যে সমাধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে সেটা সবার কাছে যত আজগুবিই মনে হোক না কেন জামশেদ তার পিছনে লেগে রইল। বছর দুয়েক পর জামশেদ তার জন্যে নির্ধারিত কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে নিজের জন্যে প্রথম একটি কাজ সম্পূর্ণ করল। কম্পিউটারজগতের প্রচলিত ভাষায় সেটিকে ভারচুয়াল রিয়েলিটি বলা হলেও জামশেদ সেটিকে নিজের কাছে 'কল্পলোক' বলে অভিহিত করতে লাগল।

জামশেদের প্রোগ্রামটি সত্যিকার জগতের কাছাকাছি একটা কৃত্রিম জগৎ। "কল্পলোক" তৈরি করার জন্যে সে তার নিজের ঘরটি বেছে নিয়েছে। ঘরের বিভিন্ন অংশের ছবি নিয়ে ডিজিটাইজ করে সে তার প্রোগ্রামের মূল ভিতটি তৈরি করেছে। ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়ানো, একটা জানালা খুলে বাইরে তাকানো, দরজা খুলে ঘরের বাইরে চলে আসা, টেবিলের উপরে রাখা বই হাতে তুলে নেয়া—এরকম খুঁটিনাটি অসংখ্য কাজ সে প্রোগ্রামের মাঝে স্থান দিয়েছে। জামশেদ যে প্রতিষ্ঠানের জন্যে কাজ করছে তার প্রায় সবাই এই কল্পলোকে কখনো না কখনো ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানের জিএম বাকি ছিলেন, একদিন তিনিও দেখতে এলেন। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বললেন, "শুনেছি তুমি আমাদের মেশিনকে বেআইনি কাজে ব্যবহার করছ!"

জামশেদ একটু থতমত খেয়ে বলল, "না মানে ইয়ে—যখন কেউ ব্যবহার করে না—"

জিএম ভদ্রলোক হা হা করে হেসে বললেন, "তুমি দেখি আমার কথা সিরিয়াসলি নিয়ে নিলে। কম্পিউটার চব্বিশ ঘণ্টা চালু রাখতে হয়—অথচ দশ পার্সেন্টও ব্যবহার করা হয় না! তুমি যদি নিজের কাজ শেষ করে অন্য কাজ কর কোনো সমস্যা নেই।"

"আমি নিজের কাজ শেষ করেই—"

"আমার সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে আঠার ঘণ্টা কাজ করে তার নিজের কাজ শেষ হয়ে যাবারই কথা! এখন দেখি তোমার শখের কাজ।"

জামশেদ জিএম ভদ্রলোকের হাতে একটা হেলমেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা মাথায় পরতে হবে।"

ভদ্রলোক হেলমেটটি মাথায় পরে ভারচুয়াল রিয়েলিটির জগতে প্রবেশ করে শিস দেবার মতো শব্দ করে বললেন, "করেছ টা কী! এ তো দেখছি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এটা বুঝি তোমার ঘর?"

"জি।"

"তুমি দেখি আমার থেকেও নোংরা। টেবিলে এতগুলি বই পাশাপাশি করে রেখেছ!"

"আপনি ইচ্ছে করলে একটা বই তুলতে পারবেন।"

জিএম মাথায় হেলমেট পরা অবস্থায় পরাবাস্তব জগতে কাল্পনিক একটা টেবিল থেকে কাল্পনিক একটা বই তুলে নিলেন। বইটা হাতে নিয়ে তার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, "কী আশ্চর্য! তুমি পুরোটা তৈরি করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"বইটা ছেড়ে দিলে কী হবে?"

"নিচে পড়বে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

জিএম ভদ্রলোক তার হাতের পরাবাস্তব বইটি ছেড়ে দিতেই সেটি সশব্দে নিচে গিয়ে পড়ল।

জিএম ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। মাথা নেড়ে বললেন, "ফিজিক্স অংশটুকুও নিখুঁত, হাত থেকে পড়তে ঠিক সময়ই নিল দেখছি! প্রোগ্রাম করার জন্যে তোমাকে ফিজিক্স শিখতে হচ্ছে!"

জামশেদ হাসিমুখে বলল, "এস.এস.সি.তে আর একটু হলে ফেল করে ফেলেছিলাম।

এইচ.এস.সি. তো দিতেই পারলাম না। তখন ব্যাপারগুলি বুঝতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি।"

"তাই হয়।" জিএম ভদ্রলোক ঘরের মাঝে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন, জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকালেন, জানালা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ ছিটকে পিছিয়ে এলেন, "মাকড়সা!"

জামশেদ হাসি হাসি মুখ করে বলল, "হ্যাঁ আমার ঘরে একটা গোবদা সাইজের মাকড়সা থাকে, ভাবলাম এখানে ঢুকিয়ে দিই।"

জিএম মাকড়সাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, "পৃথিবীর এই একটা জিনিস আমি দু চোখে দেখতে পারি না।"

জামশেদের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনি ভয় পান?"

"হ্যাঁ। ভয়, ঘেন্না এবং বিতৃষ্ণা। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, হাতপা শিরশির করতে থাকে।" জিএম-এর মুখে এক ধরনের আতংকের ছাপ ফুটে উঠতে থাকে, তিনি বিচিত্র এক ধরনের গলায় বললেন, "নড়ছে, মাকড়সাটা নড়ছে!"

"হ্যাঁ, আপনি যদি ভয় দেখান শেলফের পিছনে লুকিয়ে যাবে।"

"আর আমি যদি ঝাঁটাপেটা করি তাহলে কি মরে যাবে?"

"হ্যাঁ, মরে যাবার কথা। পোকামাকড় মরে যাবার একটা ছোট ফাংশন আছে।"

"আছে? তোমার ঘরে কোনো ঝাঁটা আছে?"

"ঝাঁটা নেই। টেবিলে খবরের কাগজ আছে, সেটাকে পাকিয়ে নিয়ে চেষ্টা করতে পারেন।"

জিএম অদৃশ্য একটি টেবিল থেকে অদৃশ্য একটা খবরের কাগজ নিয়ে সেটাকে পাকিয়ে একটা লাঠির মতো করে নিয়ে পায়ে পায়ে অদৃশ্য মাকড়সাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার মুখ শক্ত, শরীর টান টান হয়ে আছে। কাছাকাছি গিয়ে তিনি অদৃশ্য একটা মাকড়সাকে আঘাত করার চেষ্টা করে হঠাৎ লাফিয়ে পিছনে সরে এলেন। জামশেদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"বাগ! তোমার প্রোগ্রামে বাগ আছে।"

"বাগ!" জামশেদ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, প্রোগ্রামিঙের সম্পূর্ণ নূতন একটা পদ্ধতি যে আবিষ্কার করেছে, এই পদ্ধতিতে প্রোগ্রামিঙে কোনো ত্রুটি—সাধারণ ভাষায় যেটাকে "বাগ" বলা হয় থাকতে পারে না। সে এগিয়ে বলল, "কী রকম বাগ?"

জিএম নিশ্বাস ফেলে বললেন, "মাকড়সাটা শূন্যে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে সেটা আমার দিকে আসছে। আসতে আসতে সেটা বড় হচ্ছে!"

"বড় হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, আর—আর—"

"আর কী?"

ঘরের দেয়াল, ছাদ, মেঝে থেকে মাকড়সা বের হয়ে আসছে—হাজার হাজার মাকড়সা, লক্ষ লক্ষ মাকড়সা—কিলবিল করছে—" জিএম একটা বিকট আর্তনাদ করে তার হেলমেটটি খুলে নিলেন, তার সারা মুখে একটা ভয়াবহ আতংকের ছাপ। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কী সাংঘাতিক!"

ঠিক এরকম সময় হঠাৎ একটা এলার্ম বাজতে শুরু করে এবং কয়েকজন টেকনিশিয়ান

ছোটাছুটি শুরু করতে থাকে। জিএম ঘর থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"মেশিন ক্র্যাশ করেছে।"

"কীভাবে?"

"বুঝতে পারছি না। মেমোরি পার্টিশান ভেঙে গেছে।"

"কীভাবে ভাঙল?"

"বুঝতে পারছি না।"

জিএম জামশেদের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "তোমার প্রোগ্রামের বাগ—"

"কিন্তু—আমি মেমোরি পার্টিশান করেছি রীতিমতো ফায়ারওয়াল দিয়ে।"

জিএম নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটার এত জটিল যে তার সঠিক আর্কিটেকচার কেউ জানে না। যারা তৈরি করেছে তারাও না।"

"আমি দুঃখিত। আমার জন্যে—"

"তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমাদের প্রজেক্ট হয়তো এক মাস পিছিয়ে যাবে, কিন্তু তুমি যেটা করেছ সেটা অবিশ্বাস্য, ঠিক কী কারণে মেমোরি পার্টিশান ভেঙেছে যদি বের করতে পার একটা বড় কাজ হবে। কে জানে ব্যাপারটা লাইসেন্স করে নিয়ে হয়তো বিলিয়ন ডলার একটা প্রজেক্ট ধরে ফেলতে পারব।"

সন্ধেবেলা জামশেদ হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছে। তার ব্যাংকে এখন অনেক টাকা, ইচ্ছে করলে সে একটা গাড়ি কিনতে পারে, এক জন ড্রাইভার রাখতে পারে—সেই গাড়িতে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু সে কিছুই করে নি। চব্বিশ ঘণ্টার সে আঠার ঘণ্টা কাজ করে—তার আনন্দ এবং বিষাদ সবকিছুই প্রোগ্রামিঙের যুক্তিতত্ত্বের মাঝে, তার বাইরে কোনো জগৎ নেই।

জামশেদ অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দুপাশে বড় বড় বিল্ডিংগুলির দিকে তাকায়। আলোকোজ্জ্বল দোকানপাট, মানুষ যাচ্ছে এবং আসছে। রাস্তায় গাড়ি হর্ন দিতে দিতে হুসহাস করে ছুটে যাচ্ছে, চারদিকে একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম, যেন কোনো কৌশলী প্রোগ্রামারের তৈরী একটি ভারচুয়াল রিয়েলিটির প্রোগ্রাম।

জামশেদ হঠাৎ ভিতরে ভিতরে চমকে ওঠে। সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে? সত্যিই যদি এই জগৎ, এই আকাশ-বাতাস, মানুষ, পশুপাখি, তাদের সভ্যতা, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আসলে একটি কৌশলী প্রোগ্রামারের তৈরী প্রোগ্রাম? জামশেদ মাথা থেকে চিন্তাটি সরাতে পারে না। সত্যি যদি এটি একটি প্রোগ্রাম সে কি কখনো সেটা জানতে পারবে? কোনো কি উপায় রয়েছে যেটা দিয়ে সে প্রমাণ করতে পারবে যে এটি কোনো অসাধারণ প্রতিভাবান ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী মহাজাগতিক প্রাণীর কাল্পনিক জগৎ নয়? এটি সত্যি। এটি বাস্তব। কিন্তু বাস্তবতার অর্থ কী? এটি কি তার মস্তিষ্কের কিছু ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নয়? সেই সংজ্ঞাটা যে সত্যি সেটি সে কীভাবে প্রমাণ করবে? যে প্রোগ্রামার এই জগৎ তৈরি করেছে সে-ই কি এই মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনাও প্রোগ্রাম করে দেয় নি?

জামশেদের মাথা গরম হয়ে ওঠে। সে জোর করে তার মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দেয়ার চেষ্টা করে, তার চারপাশে ঘুরে তাকায়। সামনে একটা বড় দোকানের সামনে কিছু কিশোর জটলা করছে। খালি পা, জীর্ণ প্যান্ট এবং বোতামহীন শার্ট—মাথায় উস্কখুস্ক চুল।

জামশেদের হঠাৎ করে তার ভাইয়ের বাসার কাজের ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। ভাবির সোনার বালাটি চুরি করার পর তাকে যেরকম নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছিল দৃশ্যটি তার আবার মনে পড়ে যায়। ভাইয়ের শক্তপোক্ত শরীরের শক্তিশালী হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ঠোঁট থেঁতলে গিয়েছে, নাকমুখ রক্তে মাখামাখি, চোখ একটা বুজে গিয়েছে—জামশেদ জোর করে মাথা থেকে দৃশ্যটি সরিয়ে দেয়। তার জন্যে এই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছেলেটির জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হল। কোথায় আছে এখন ছেলেটি?

জামশেদের ভিতরে প্রচণ্ড একটা অপরাধবোধ এসে ভর করে। সেই ছেলেটির সাথে দেখা হলে সে ছেলেটির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তার অপরাধের বোঝা লাঘব করে দিতে পারত। কিন্তু আর কখনো তার সাথে দেখা হয় নি। মনে মনে সে ছেলেটিকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু পৃথিবী বিশাল একটি ক্ষেত্র, সেখানে মানুষ অবলীলায় হারিয়ে যায়। এখানে মানুষ কৌশলী কোনো এক প্রোগ্রামারের অসংখ্য রাশিমালার ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর একটি রাশি, মেমোরির তুচ্ছ একটি বিট।

জামশেদ একটা নিশ্বাস ফেলে সামনে তাকাল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে কখন লেকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করে নি। বিকেলবেলা জায়গাটি মানুষের ভিড়ে জনাকীর্ণ হয়ে থাকে, এখন মোটামুটি ফাঁকা। কাগজের ঠোঙা, বাদামের খোসা, সিগারেটের খালি প্যাকেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দৃশ্যটিতে কেমন যেন এক ধরনের নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা লুকিয়ে আছে। জামশেদ কী মনে করে লেকের পাশে একটা বেঞ্চে বসল। সম্পূর্ণ অকারণে তার মনটি কেন জানি খারাপ হয়ে আছে।

"ভাই।" হঠাৎ করে গলার স্বর শুনে জামশেদ চমকে ঘুরে তাকাল। বেঞ্চের অন্যপাশে কে যেন বসে আছে, আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। জামশেদ ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কে?"

"আমি ভাই। আমারে চিনতে পারছেন না?"

জামশেদ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, তার ভাইয়ের বাসার সেই কাজের ছেলেটি। নাক এবং মুখ থেঁতলে আছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। একটি চোখ বুজে আছে।

"তুই?"

"হ্যাঁ।"

"তু-তুই কোথা থেকে? তোর চেহারা এরকম কেন?"

"মনে নাই? আপনি বেগম সাহেবের সোনার বালা চুরি করলেন? তারপরে—"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি জানি। তারপর সবাই আমাকে মিলে মারলেন। এই দেখেন সামনের দুইটা দাঁত ভেঙে গেছে—" ছেলেটি আবছা অন্ধকারে তার মুখ খুলে দেখানোর চেষ্টা করল, জামশেদ ভালো করে দেখতে পারল না।

জামশেদের সারা শরীরে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে ওঠে—এটি কি সত্যি? সে ভালো করে তাকাল, আবছা অন্ধকারে সত্যি সত্যি ছেলেটি বেঞ্চের অন্যপাশে বসে আছে। এত কাছে যে সে হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারবে। জামশেদ খানিকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থেকে বলল, "তুই কোথা থেকে এসেছিস?"

ছেলেটি অনির্দিষ্টভাবে বলল, "হই ওখান থেকে।"

"কেন?"

"আপনি আমার সাথে দেখা করতে চান সেই জন্যে।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

ছেলেটি উদাস গলায় বলল, "আমি জানি।"

জামশেদ হঠাৎ হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারে। তার অনুমান সত্যি। এই সমস্ত জগৎ, আকাশ-বাতাস, মানুষ, পশুপাখি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আসলে একজন কৌশলী প্রোগ্রামারের সৃষ্টি। কোনো প্রোগ্রাম নিখুঁত নয়, তার ত্রুটি থাকে। ভারচুয়াল রিয়েলিটির প্রোগ্রামে ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটিতে স্পর্শ করামাত্র এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটারের সমস্ত সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা ত্রুটি সযত্নে গড়ে তোলা জটিল একটা প্রোগ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশাল এই সৃষ্টিজগতের এই প্রোগ্রামেরও ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটিটি তার চোখের সামনে ধরা পড়েছে। তার বাসার কাজের ছেলেটি তার কাছে এসে বসে আছে। কোনো যুক্তি নেই, কোনো কারণ নেই, তবু সে চুপচাপ বসে আছে। এখন এই ত্রুটিটি স্পর্শ করলে কি এই প্রোগ্রামটিও ধ্বংস হয়ে যাবে?

জামশেদ আবার ঘুরে তাকাল, মনেপ্রাণে সে আশা করছিল সে তাকিয়ে দেখবে তার পাশে কেউ নেই, পুরোটা তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের একটা কল্পনা। কিন্তু সেটা সত্যি নয়, তার পাশে ছেলেটি বসে আছে। মুখ রক্তাক্ত, ঠোঁটটা কেটে গেছে, একটা চোখ বুজে আছে।

জামশেদ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, দেখতে পেল তার পাশে খুব ধীরে ধীরে দ্বিতীয় আরেকজন ছেলে স্পষ্ট হয়ে আসছে। হুবহু একই রকম চেহারা, স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশে আরেকজন। তার পাশে আরো অসংখ্য। হ্যাঁ, এটি একটি ত্রুটি। নিঃসন্দেহে প্রোগ্রামের একটি ত্রুটি।

জামশেদ চোখ বন্ধ করে ফেলল, না সে আর দেখতে চায় না। বিশাল এই প্রোগ্রামের ত্রুটিটি স্পর্শ করে পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দিতে চায় না। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে, যেন একটু নড়লেই পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল সে জানে না। এক সময় সে চোখ খুলে তাকাল। চারদিকে অসংখ্য ছেলে, মুখ রক্তাক্ত, থেঁতলানো ঠোঁট, চোখ বুজে আছে যন্ত্রণায়। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা কি সত্যিই আছে নাকি একটা বিভ্রম? একবার কি ছুঁয়ে দেখবে?

স্পর্শ করবে না করবে না ভেবেও জামশেদ তার হাত এগিয়ে দিল ছোঁয়ার জন্যে.....

* * * * * *

"কী হল?"

"পুরোটা আবার ধ্বংস হয়ে গেল।"

"আবার চালু করবে?"

দীর্ঘ সময় নীরবতার পর কে যেন বলল, "নাহ্! আর ইচ্ছে করছে না।"

ওয়াই ক্রমোজম

গোল চত্বরটি নিশ্চয়ই এক সময় এই শহরের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, বিকেলবেলা মানুষেরা এখানে হয়তো ভিড় করে আসত সময় কাটাতে। শিশুরা আসত তাদের মায়ের পিছু পিছু, তরুণ-তরুণীরা আসত হাত ধরাধরি করে। কাফেতে উচ্চ তালের সঙ্গীতের সাথে হইহুল্লোড় করত শ্রমজীবী মানুষেরা। এখন কোথাও কেউ নেই। নিয়ানা রেলিঙে হেলান দিয়ে সামনে তাকাল, যতদূর চোখ যায় ধু-ধু জনমানবহীন। সারা পৃথিবী জুড়ে এরকম লক্ষ লক্ষ শহর এখন জনহীন মৃত। মাত্র এক বছরের মাঝে ল্যাবরেটরির গোপন ভল্ট থেকে ছাড়া পাওয়া ভাইরাস মিটুমাইন পৃথিবীর প্রায় সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সাধারণ ফ্লুয়ের মতো উপসর্গ হত প্রথমে, তৃতীয় দিনে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মানুষ পোকামাকড়ের মতো মারা যেতে শুরু করল। পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সব চিহ্ন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল—আকাশচুম্বী দালান, দীর্ঘ হাইওয়ে, কলকারখানা, লাইব্রেরি, দোকানপাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, মিউজিয়াম—শুধু কোথাও কোনো মানুষ রইল না। নিয়ানার মতো অল্প কিছু মানুষ শুধু বেঁচে রইল, প্রকৃতির বিচিত্র কোনো খেয়ালে তাদের জিনেটিক কোডিং মিটুমাইন ভাইরাসের আক্রমণে কাবু হল না; সারা পৃথিবীতে এখন বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা হাত দিয়ে গোনা যায়। সূর্যের পড়ন্ত আলোতে—মৃত একটি শহরের জনমানবহীন ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে নিয়ানার পুরো ব্যাপারটিকে একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তার বেঁচে থাকার ব্যাপারটি কি সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য এখনো সে বুঝে উঠতে পারে না।

খুব ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। নিয়ানা এখানে একা একা আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবে, তারপর হেঁটে হেঁটে যাবে শহরের ভেতর। কোনো একটি বাসার দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকবে; সেখানে সাজানো ঘর থাকবে, বিছানা থাকবে, রান্নাঘরে চুলোর উপর কেতলি বসানো থাকবে, ছোটশিশুর খেলাঘর থাকবে, লাইব্রেরিঘরে বই থাকবে, দেয়ালে পরিবারটির হাস্যোজ্জ্বল ছবি থাকবে, শুধু কোথাও কোনো মানুষ থাকবে না। মিটুমাইন ভাইরাসের প্রবল আতংকে সব মানুষ ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, পাহাড়ে বনে ক্ষেতে খামারে—কেউ রক্ষা পায় নি শেষ পর্যন্ত। সেই জনমানবহীন ভুতুড়ে ঘরের এক কোনায় নিয়ানা স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকবে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সে অপেক্ষা করবে রাত কেটে ভোর হওয়ার জন্যে।

দিনের আলোতে আবার সে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে জীবিত মানুষের খোঁজে। পৃথিবীর সব জীবিত মানুষকে একত্র না করলে আবার কেমন করে শুরু হবে নূতন পৃথিবী? হয়তো তারই মতো নিঃসঙ্গ কোনো তরুণ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুঁজছে তারই মতো কোনো তরুণীকে। তারা দুজন দুজনকে সান্ত্বনা দেবে, সাহস দেবে, শক্তি দেবে, ভালবাসা দেবে, নূতন পৃথিবীর জন্ম দেবে।

রাত কাটানোর জন্যে নিয়ানা যে বাসাটি বেছে নিল তার বাইরে ফুলের বাগান আগাছায় ঢেকে গেছে। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে বাসার সিঁড়ি ধুলায় ধূসরিত। দরজা ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচক্যাঁচ

শব্দ করে খুলে গেল। দেয়ালে হাত দিয়ে সুইচ অন করতেই আলো জ্বলে উঠল। কী আশ্চর্য! বাসাটিতে ইলেকট্রিসিটির জন্যে যে ব্যাটারি রেখেছিল এখনো সেটি কাজ করছে।

ঘরের কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসল নিয়ানা, পিঠ থেকে ব্যাগ নামিয়ে শুকনো কিছু খাবার বের করল, তার সাথে পানির বোতল। শুকনো খাবার চিবিয়ে চিবিয়ে খেল সে দীর্ঘ সময় নিয়ে, তারপর বোতল থেকে খানিকটা পানি খেয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকে গেল। দীর্ঘ সময় সে নিদ্রাহীন চোখে শুয়ে রইল। সারাদিন হেঁটে হেঁটে সে ক্লান্ত, কিন্তু তবু তার চোখে ঘুম আসে না। বিশাল পৃথিবীতে একা নিঃসঙ্গ বেঁচে থাকার মতো কঠিন বুঝি আর কিছু নয়! নিয়ানার মনে হয়, কখনোই তার চোখে ঘুম আসবে না, কিন্তু এক সময় নিজের অজান্তেই ঘুম নেমে এল।

নিয়ানার ঘুম ভাঙল একটি শব্দে, মনে হল সে কারো গলার স্বর শুনতে পেয়েছে, চমকে উঠে বসল সে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল আবার, আবার সে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। এবারে এক জনের নয়, একাধিক জনের। কী আশ্চর্য! নিয়ানা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, জীবিত মানুষ এসেছে এখানে। সে প্রায় ছুটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল, পরদা সরিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করল তীক্ষ্ণ চোখে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি তিন জন ছায়ামূর্তি নিচু গলায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে এই বাসার দিকে। উত্তেজনায় নিশ্বাস নিতে ভুলে যায় সে, দুই হাত নেড়ে চিৎকার করে ওঠে আনন্দে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল নিয়ানা, অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে রইল মানুষ তিন জনের জন্যে। এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না, মানুষ এসেছে তার কাছে, সত্যিকারের জীবন্ত মানুষ!

মানুষ তিন জন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে পিঠ থেকে ঝোলা নিচে নামিয়ে রাখল। নিয়ানা কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না, কোনোমতে নিজেকে সংবরণ করে বলল, "তোমাদের দেখে কী যে ভালো লাগছে আমার! কতদিন থেকে আমি মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি বিশ্বাস করবে না।"

মানুষ তিন জন কোনো কথা না বলে নিয়ানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তিন জনের ভিতরে দুজন মধ্যবয়স্ক, তৃতীয় জন প্রায় তরুণ। গায়ের জামাকাপড় ধূলিধূসরিত। ক্লান্তিজনিত কারণের জন্যেই কি না কে জানে, চেহারায় এক ধরনের কঠোরতার ছাপ রয়েছে। নিয়ানা তাদের ঝোলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল— সেখান থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উঁকি দিচ্ছে। নিয়ানা আবার বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত? আমার কাছে কিছু শুকনো খাবার আছে। এই বাসায় খুঁজলে—"

নিয়ানাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ জিজ্ঞেস করল, "তোমার বয়স কত?"

নিয়ানা থতমত খেয়ে বলল, "বয়স? আমার?"

"হ্যাঁ।"

"উনিশ। এই বসন্তে উনিশ হয়েছি।"

মানুষটি জিব দিয়ে এক ধরনের শব্দ করে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিশ্বাস করতে পার? উনিশ বছরের একটা যুবতী পেয়ে গেলাম।"

নিয়ানা মানুষটির কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে বলল, "কী? কী বলছ তুমি?"

মানুষটি কোনো কথা না বলে জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে হঠাৎ একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসতে থাকে। নিয়ানা হঠাৎ এক ধরনের ভয়ংকর আতংক অনুভব করে।

"এক থেকে তিনের মাঝে একটা সংখ্যা বল দেখি সুন্দরী।"

নিয়ানা ঢোক গিলে বলল, "কেন?"

"আমাদের তিন জনের মাঝে কে তোমাকে নিয়ে প্রথমবার স্ফূর্তি করব সেটা ঠিক করব।"

মানুষটির কথা শুনে অন্য দুজন মানুষ হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। নিয়ানা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে পিছিয়ে গিয়ে দেয়াল স্পর্শ করে দাঁড়াল, হঠাৎ তার মনে হতে থাকে সে বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। জোরে জোরে কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "কী বলছ তোমরা? সারা পৃথিবীতে এখন মাত্র আমরা কয়েকজন মানুষ। এখন আমরা সবাই যদি একে অন্যকে সাহায্য না করি, মিলেমিশে না থাকি—"

"মিলে-মিশে মিলে-মিশে—" তরুণটি হঠাৎ একটা কুৎসিত ভঙ্গি করে বলল, "তাই তো করব! মিলে-মিশে যাব।"

"না!" নিয়ানা করুণ চোখে বলল, "তোমরা এরকম করতে পারবে না। দোহাই তোমাদের—ঈশ্বরের দোহাই—"

মধ্যবয়স্ক নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি এক পা এগিয়ে এল। তার চোখে এক ধরনের হিংস্র লোলুপ ভাব স্পষ্ট হয়ে এসেছে, জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "পৃথিবীতে এখন কোনো মানুষ নেই মেয়ে। আইন তৈরি হয় মানুষের জন্যে, যেহেতু মানুষ নাই তাই আইনও নাই। আমরা যেটা বলব সেটা হবে আইন। যেটা করব সেটা হবে নিয়ম।"

মানুষটি আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে নিয়ানাকে স্পর্শ করে বলল, "আস সুন্দরী। লজ্জা কোরো না—"

ভয়াবহ আতংকে নিয়ানা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

* * * * * *

মানুষটি মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে আছে, তার হাত দুটি পিছনে শক্ত করে বাঁধা। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন নানা বয়সী মেয়ে, সবার হাতেই কোনো না কোনো ধরনের অস্ত্র। মানুষটি মাথা তুলে কাতর গলায় বলল, "আমাকে কেন তোমরা ধরে এনেছ?"

মানুষটির সামনে একটা উঁচু চেয়ারে একটি মেয়ে বসে আছে, সাদা কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢাকা। মেয়েটি তার মুখের কাপড় খুলে বলল, "আমার দিকে তাকাও।"

মানুষটি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে চোখ নামিয়ে ফেলল। মেয়েটি সাদা কাপড় দিয়ে মুখটি ঢেকে ফেলে বলল, "আমার নাম নিয়ানা। ছয় বছর আগে তিন জন মানুষ আমার এই অবস্থা করেছে। কোনো কারণ ছিল না, তারা এটা করেছে শুধু আনন্দ করার জন্যে। পেট্রোল ঢেলে আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা হা হা করে হেসেছে। আমাকে গুলি করার আগে বলেছে, পৃথিবীতে এখন কোনো আইন নেই। আনন্দ করার জন্যে তারা যেটা করবে সেটাই হচ্ছে আইন। আমি জানতাম না মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ হয়। আমি জানতাম না নিষ্ঠুরতার মাঝে এত আনন্দ থাকে।"

নিয়ানার সামনে মানুষটি মাথা নিচু করে বসে রইল। নিয়ানা একটা নিশ্বাস নিয়ে মাথা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার মরে যাবার কথা ছিল। বুকের মাঝে দুটি বুলেট নিয়ে কেউ বেঁচে থাকে না। কোনো ডাক্তার আমাকে চিকিৎসা করে নি, কোনো হাসপাতালে আমাকে নেয়া হয় নি, তবু আমি মরি নি। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আমি তখন নিশ্চিত হয়েছি, ঈশ্বরের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।"

নিয়ানা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান সেই উদ্দেশ্য কী?"

মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কারণ তিনি চান আমি এই পৃথিবীকে একটি সুন্দর পৃথিবীতে পাল্টে দিয়ে যাই—যে পৃথিবীতে কোনো নিষ্ঠুরতা থাকবে না, কোনো হিংস্রতা থাকবে না, ভায়োলেন্স থাকবে না। যে পৃথিবী হবে শান্ত সুন্দর কোমল একটি পৃথিবী। ভালবাসার পৃথিবী। কেমন করে হবে সেটি তুমি জান?"

মানুষটি মাথা নাড়ল, "না, জানি না।"

"পৃথিবী থেকে সকল পুরুষমানুষকে সরিয়ে নিয়ে। কারণ পুরুষমানুষের মাঝে রয়েছে এক ধরনের ভায়োলেন্সের বীজ। তাদের ওয়াই ক্রমোজমে নিশ্চয়ই রয়েছে সেই ভায়োলেন্সের জিনস। অন্যায় আর অবিচারের জিনস। তুমি জান প্রকৃতির কোনো খেয়ালে যদি কারো দেহে বাড়তি আরো একটি ওয়াই জিনস থাকত তাহলে কী হত?"

"কী হত?"

"সেই মানুষ হত বড় অপরাধী। পৃথিবীতে যখন মানুষ বেঁচে ছিল তখন জেলখানায় অপরাধীদের গবেষণা করে এই তথ্য বের হয়েছিল। শরীরে একের অধিক ওয়াই জিনস থাকলে তার অপরাধী হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের সেটা নিয়ে দ্বিমত ছিল আমার কোনো সন্দেহ নেই। পুরুষমাত্রই নৃশংস এবং নিষ্ঠুর। সমাজে বেঁচে থাকার জন্যে তারা সেটাকে চেপে রাখে। কেউ বেশি কেউ কম। যদি আইনের ভয় না থাকে তাদের ভিতর থেকে সেই হিংস্র পশু বের হয়ে আসে—"

"না।" মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "এটি সত্যি হতে পারে না। পুরুষমানুষ শুধু অন্যায় করেছে, নিষ্ঠুরতা করেছে—সেটি সত্যি হতে পারে না। তাদের মাঝে ভালো মানুষ আছে। মহৎ মানুষ আছে—'

"সব ভান। তাদের ভালোমানুষি এবং মহত্ত্ব হচ্ছে লোক দেখানো অভিনয়। তাদের হৃদয়ের ভিতরে লুকানো রয়েছে তাদের প্রকৃত রূপ। নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতা। আমার কথা যদি বিশ্বাস না কর তাহলে চারদিকে ঘুরে তাকাও। তোমার চারপাশে যেসব মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জিজ্ঞেস কর।"

মানুষটি ভীত চোখে তার চারপাশের সবাইকে দেখে মাথা নিচু করল। নিয়ানা তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল, "আমি ঘুরে ঘুরে সারা পৃথিবীর দুঃখী মেয়েদের একত্র করেছি। সংগঠিত করেছি। তাদের সশস্ত্র করেছি। তারপর সেই সশস্ত্র-সংগঠিত মেয়েদের নিয়ে একটি একটি পুরুষকে হত্যা করে এই পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করেছি।"

নিয়ানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ তীব্র গলায় বলল, "তুমি হচ্ছ পৃথিবীর শেষ পুরুষমানুষ। তোমার দেহে রয়েছে পৃথিবীর শেষ ওয়াই ক্রমোজম। তোমাকে শেষ করা হলে পৃথিবীর শেষ ওয়াই ক্রমোজম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে আর কখনো কোনো পুরুষমানুষের জন্ম হবে না।"

"কিন্তু-কিন্তু—" মানুষটি রক্তহীন মুখে বলল, "শুধু যে পুরুষমানুষের জন্ম হবে না তা-ই নয়, কোনো মানুষেরই জন্ম হবে না। সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। একজন শিশুকে জন্ম নিতে হলে পুরুষ এবং নারী দুই-ই প্রয়োজন।"

"ভুল!" নিয়ানা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "ভুল বলেছ, সন্তানের জন্ম দিতে পুরুষের প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র মেয়ের প্রয়োজন। তুমি দেখতে চাও?"

মানুষটি অবাক হয়ে নিয়ানার কাপড়ে ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়ানা হাত

দিয়ে ইঙ্গিত করতেই ভেতর থেকে একটি নবজাতক শিশুকে বুকে ধরে উনিশ-বিশ বছরের একটি মেয়ে বের হয়ে এল। নিয়ানা শিশু এবং তার মাকে দেখিয়ে বলল, "এই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। সবচেয়ে শাশ্বত দৃশ্য। মায়ের বুকে শিশু। দৃশ্যটি সত্যিকারের শাশ্বত হয়ে যায় যখন সেই শিশুটি হয় একটি মেয়েশিশু।"

নিয়ানার সামনে উবু হয়ে বসে থাকা হাতবাঁধা মানুষটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিয়ানার দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, "এই মায়ের গর্ভে এই শিশুটির জন্ম হয়েছে। সুস্থ সবল প্রাণবন্ত একটি শিশু। কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়া এই শিশুর জন্ম হয়েছে। মায়ের শরীরের একটি কোষ থেকে তার ছেচল্লিশটি ক্রমোজম আলাদা করে তার ডিম্বাণুতে প্রবেশ করিয়ে তার গর্ভেই বসানো হয়েছে। অনেক পুরোনো পদ্ধতি। এর নাম হচ্ছে ক্লোনিং। মানুষের ক্লোন করতে পুরুষমানুষের প্রয়োজন হয় না।"

মানুষটি হতচকিতের মতো নিয়ানার দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়ানা নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, "আমরা এর মাঝে অসংখ্য শিশুর জন্ম দিয়েছি। তারা বড় হলে আরো অসংখ্য শিশুর জন্ম হবে। তারা জন্ম দেবে আরো শিশুর, পৃথিবী থেকে সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হবে না—সেটি বরং আরো নূতন করে গড়ে উঠবে।"

"কিন্তু সেখানে থাকবে শুধু নারী?"

"হ্যাঁ। একজন পুরুষ অন্য একজন মানুষকে জন্ম দিতে পারে না, কিন্তু একজন নারী পারে। কারো সাহায্য না নিয়ে সে একা আরেকজনকে জন্ম দিতে পারে। তাই নারী হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। পুরুষ বাহুল্য। সৃষ্টিজগৎ থেকে আমরা সেই বাহুল্যকে দূর করে দিচ্ছি।"

মানুষটি কাতর গলায় বলল, "তুমি এ কী বলছ? সারা পৃথিবীতে থাকবে শুধু নারী? এক নারীর ক্লোন থেকে জন্ম নেবে অন্য নারীর ক্লোন?"

"হ্যাঁ।"

"কিছু পুরুষ তোমার সাথে নৃশংসতা করেছে বলে তুমি পৃথিবী থেকে সমস্ত পুরুষ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছ?"

"না।" নিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, "তুমি ভুল বুঝো না। আমার সাথে নিষ্ঠুরতার এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথে নিষ্ঠুরতা করেছে বলে আমার এটা উপলব্ধি হয়েছে, সৃষ্টির এই রহস্যটি আমি বুঝতে পেরেছি এর বেশি কিছু নয়। পুরুষের ওপরে আমার কোনো ক্রোধ নেই। অনুকম্পা আছে।"

নিয়ানা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। উবু হয়ে বসে থাকা মানুষটিকে ঘিরে দাঁড়ানো মেয়েগুলিকে বলল, "একে নিয়ে যাও তোমরা। এ হচ্ছে পৃথিবীর শেষ পুরুষমানুষ। এর প্রতি করুণাবশত তোমরা চেষ্টা কোরো তার মৃত্যুটি যেন হয় যন্ত্রণাহীন।"

মেয়েগুলি মাথা নাড়ল, একজন বলল, "আমরা চেষ্টা করব মহামান্য নিয়ানা।"

নিয়ানা দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পেল পৃথিবীর শেষ পুরুষমানুষটি মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে, তাকে ঘিরে রেখেছে সশস্ত্র মেয়েরা। এই মানুষটির দেহে রয়েছে শেষ ওয়াই ক্রমোজম, পৌরুষত্বের বীজ। কিছুক্ষণ পর এই পৃথিবীতে আর একটি ওয়াই ক্রমোজমও থাকবে না।

নিয়ানা নিশ্বাস ফেলে ভাবল, সেই পৃথিবী নিশ্চয়ই হবে ভালবাসার কোমল একটি পৃথিবী।

অন্য জগৎ

১

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার অপ্রসন্নমুখে ল্যাবরেটরিঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তার অপ্রসন্ন থাকার কোনো কারণ নেই—তৃতীয় বিশ্বের সাদামাঠা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক থেকে হঠাৎ করে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়ে গেছেন, নিউজউইকে তার ওপরে একটা আলোচনা বের হয়েছে। বি.বি.সি. এবং সি.এন.এন. থেকে ইন্টারভিউ নিতে আসছে—কিন্তু তবু তার মেজাজ-মর্জি ভালো নয়। কারণটি কেউ জানে না, যে জানে সে এ বিষয়ে মুখ খুলবে না এবং তার মেজাজটি সে কারণেই অপ্রসন্ন! যে আবিষ্কারটির জন্যে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন সেটি তার নিজের আবিষ্কার নয়, ব্যাপারটি বের করেছে তার এক ছাত্র, জার্নালে প্রকাশ করার সময় প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার কায়দা করে নিজের নামটি আগে দিয়ে মূল আবিষ্কারক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। ছাত্রটি সেটি নিয়ে কোনো ধরনের হইচই করলে তিনি তাকে কৌশলে পুরো ব্যাপার থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু ছাত্রটির খ্যাতি বা সম্মানের দিকে বিন্দুমাত্র লোভ আছে বলে মনে হয় না। বরং তার আবিষ্কারটি কাসেম জোয়ারদার নিজের নামে ব্যবহার করে বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছেন এই ব্যাপারটিতে সে এক ধরনের কৌতুক অনুভব করছে বলে মনে হয়। প্রফেসর জোয়ারদারের মেজাজটি অপ্রসন্ন, সে কারণেই, নিজের ছাত্রের সামনে কেমন যেন নীচ হয়ে আছেন।

প্রফেসর জোয়ারদার ল্যাবরেটরিঘরের দরজায় একটু শব্দ করে ভেতরে এসে ঢুকলেন এবং শব্দ শুনে তার ছাত্র তারেক রহমান মাথা ঘুরে তাকাল। তার শিক্ষককে দেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার, বি.বি.সি. আর সি.এন.এন. থেকে নাকি ইন্টারভিউ নিতে আসছে?"

"হ্যাঁ।"

"বাহ! আপনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন স্যার।"

জোয়ারদার কোনো কথা বললেন না। তারেক হালকা গলায় বলল, "সময় পরিভ্রমণের ব্যাখ্যাটা করার সময় বেশি টেকনিক্যাল দিকে যাবেন না স্যার।"

"কেন?"

"বিদেশী সাংবাদিকরা খুব ত্যাঁদোড় হয় স্যার। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব বের করে নেয়। জিনিসটা বোঝায় কোনো ফাঁক থাকলে তারা বুঝে ফেলবে।"

প্রফেসর জোয়ারদার মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার এখন বলা উচিত ছিল, তারেক এটি তোমার আবিষ্কার তুমি ইন্টারভিউ দাও। কিন্তু তিনি বলতে পারলেন না। শুধু যে বলতে পারলেন না তাই নয়, তারেক নামের অল্পবয়স্ক হাসিখুশি এই তরুণটির বিরুদ্ধে কেমন জানি খেপে উঠলেন। মুখে তিনি তার কিছুই প্রকাশ করলেন না, জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "তোমার কাজের কী অবস্থা?"

"ভালো স্যার। শুধু মাইক্রোস্কোপিক নয় মনে হচ্ছে, বড় জিনিসও সময় পরিভ্রমণ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে। সাংঘাতিক ব্যাপার স্যার।"

জোয়ারদার একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে করছ?"

"বলব স্যার আপনাকে। পজিটিভ একটা রেজাল্ট পেলেই পুরোটা আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

জোয়ারদার আবার মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

২

ইন্টারভিউ নিতে যারা এসেছে তাদের মাঝে একজনের পদার্থবিজ্ঞানে ডিগ্রি আছে খবর পেয়ে জোয়ারদার একটু ভয়ে ভয়ে ছিলেন, কিন্তু দেখা গেল মানুষটি কঠিন কোনো প্রশ্ন করল না। ঘুরেফিরে তারা শুধু একটি প্রশ্নই করল, "ভবিষ্যতে কি সত্যিই সময় পরিভ্রমণ সম্ভব হবে?"

জোয়ারদার মাথা নেড়ে বললেন, "আমরা দেখিয়েছি একটা পরমাণু সময়ের বিপরীতে ভ্রমণ করতে পারে। যে পরীক্ষাটি নিয়ে পৃথিবীজোড়া হইচই হচ্ছে সেটি আমরা করেছি আমাদের ল্যাবরেটরিতে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটা এটমকে আমরা ভবিষ্যৎ থেকে টেনে এনেছি অতীতে। এখন কাজ করছি গ্রাফাইট ক্রিস্টালের ওপর। তারপর নেব আরো বড় জিনিস।"

"তার মানে আপনি বলছেন সময়ে পরিভ্রমণ সম্ভব?"

"অবশ্যি সম্ভব।"

"মনে করুন আপনি সময় পরিভ্রমণ করে অতীতে আপনার শৈশবে ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে আপনার শিশু অবস্থায় থাকা বাচ্চাটিকে মেরে ফেললেন। তাহলে আপনি এখন আসবেন কোথা থেকে?"

প্রফেসর জোয়ারদার থতমত খেয়ে গেলেও খুব কায়দা করে নিজেকে সামলে নিয়ে হা হা করে হেসে বললেন, "আমাকে দেখে কি তাই মনে হয় যে আমি বাচ্চা শিশুদের খুনখারাপি করে বেড়াই?"

ইন্টারভিউয়ে ব্যাপারটা ঠাট্টা করে কাটিয়ে দিলেও প্রশ্নটা জোয়ারদারের ভিতরে খচখচ করতে লাগল। সত্যিই তো, সময় পরিভ্রমণ করে কেউ যদি অতীতে গিয়ে নিজেকে মেরে ফেলে তাহলে সে আসবে কোথা থেকে? সুযোগ বুঝে তিনি তারেককে প্রশ্নটা করলেন। প্রশ্নের ভাষাটা হল খুব খটমটে যেন সেটাকে একটা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মতো শোনায়। জিজ্ঞেস করলেন, "সময় পরিভ্রমণে যে ঘটনার পারস্পরিকতা নষ্ট হয় সেটা উদ্ধার করা হয় কীভাবে?"

তারেক চোখ পিটপিট করে বলল, "কী বলছেন বুঝতে পারলাম না স্যার।"

"মনে কর একটা পার্টিকেল সময় পরিভ্রমণ করে নিজের সাথে কলিশন করল।"

"ও! অতীতে গিয়ে নিজেকে মেরে ফেলার প্যারাডক্স? ইন্টারভিউতে আপনাকে যে প্রশ্নটা করেছিল?"

প্রফেসর জোয়ারদারের কান একটু লাল হয়ে গেল, নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে তাই।"

"এর দুইটা ব্যাখ্যা হতে পারে। এক. সময় পরিভ্রমণ করে নিকট অতীতে যাওয়া যাবে না, দূর অতীতে যেতে হবে। তাতে নিজেকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। পূর্বপুরুষদের কাউকে হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তখন এত জটিলতা থাকবে যে অন্য কোনোভাবে জন্ম হওয়া সম্ভব। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে—"

তারেক একটু চুপ করে বলল, "আমরা আমাদের যে জগৎ দেখছি তার মতো আরো অসংখ্য জগৎ আছে। সেগুলি একই সাথে পাশাপাশি যাচ্ছে বলে আমরা দেখতে পাই না।"

"পাশাপাশি?"

"হ্যাঁ। সময় পরিভ্রমণ করে আমরা নিজেদের জগতে যেতে পারি না, অন্য একটা জগতে চলে যাই।"

জোয়ারদার মুখ অল্প হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। কমবয়সী এই ছেলেটি যুগান্তকারী একটা পরীক্ষা করে পৃথিবীতে একটা ইতিহাস সৃষ্টি না করে থাকলে তিনি তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু এখন কিছুই আর উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রফেসর জোয়ারদার আমতা আমতা করে বললেন, "সেই জগৎ কি আমাদের এই জগতের মতো?"

তারেক মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। কাছাকাছি জগৎগুলি আমাদের এই জগতের মতো। আমার ধারণা, কাছাকাছি জগৎগুলিতে আপনি রয়েছেন, আমি রয়েছি। আমি হয়তো একটু ভিন্ন ধরনের, আপনিও হয়তো একটু ভিন্ন।"

"তুমি—তুমি প্রমাণ করতে পারবে?"

"চেষ্টা করছি স্যার। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি ভবিষ্যৎ থেকে কিছু আনার। যদি আনতে পারি প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"কীভাবে প্রমাণ হবে?"

তারেক রহস্যের ভঙ্গিতে হেসে বলল, "স্যার, সময় হলেই দেখবেন।"

জোয়ারদার তার হাসি দেখে কেমন যেন মিইয়ে গেলেন।

৩

সপ্তাহখানেক পর তারেক খুব উত্তেজিত হয়ে প্রফেসর জোয়ারদারের ঘরে ছুটে এল। বলল, "সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে স্যার!"

"কী হয়েছে?"

"ভবিষ্যৎ থেকে কিছু জিনিস এনেছি।"

"কী জিনিস?"

"একটা স্ক্রু ড্রাইভার, দুইটা ছোট আই.সি. আর—"

"আর কী?"

"আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার।"

"কী?"

"একটা খবরের কাগজের অংশ। ডেইলি হরাইজন।"

জোয়ারদার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না, একটু অস্বস্তি নিয়ে তারেকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারেক বলল, "খবরের কাগজটা আগামী পরশুদিনের।"

"পরশুদিনের?"

"হ্যাঁ। এই দেখেন।"

জোয়ারদার খবরের কাগজটা দেখলেন, সাদামাঠা কাগজ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এর মাঝে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার থাকতে পারে। কিন্তু এটি সাদামাঠা কাগজ নয়, এই কাগজটি দুদিন পরে ছাপা হবে, দুদিন পরে কী কী ঘটবে সব এখানে লেখা রয়েছে। ভবিষ্যতের ছোট একটা অংশ এখানে চলে এসেছে। জোয়ারদার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তারেক বাধা দিয়ে বলল, "আমার একটা জিনিস সন্দেহ হচ্ছে স্যার। সাংঘাতিক সন্দেহ হচ্ছে।"

"কী জিনিস?"

তারেক আবার রহস্যের হাসি হেসে বলল, "এখন বলব না স্যার, আগে প্রমাণ হাজির করি তখন বলব।"

"কী প্রমাণ হাজির করবে?"

"সময় হলেই দেখবেন।"

তারেক ডেইলি হরাইজনের কিছু ফটোকপি করে মূল খবরের কাগজটি একটি খামে ভরে পোস্টঅফিসে নিয়ে নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে পোস্ট করে দিল। কাগজটি যে দুদিন আগেই হাজির হয়েছে সেটা প্রমাণ করার এটা হবে খুব সহজ সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ।

দুদিন পর যখন ডেইলি হরাইজন পত্রিকা বের হল, তারেক ভোরবেলাতেই কয়েকটা কপি নিয়ে এসে ল্যাবরেটরিতে বসল। দুদিন আগে পাওয়া খবরের কাগজটির ফটোকপি করে রাখা আছে, তার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। মিলিয়ে কিছু বিচিত্র জিনিস দেখা গেল। যদিও খবরের কাগজ দুটি প্রায় একই রকম, হেডলাইন, মূল বিষয় সম্পাদকীয়, ছবি, বিজ্ঞাপন—সবকিছুই রয়েছে, তবুও খবরের কাগজ দুটি হুবহু একরকম নয়। এক-দুটি শব্দ অন্যরকম। এক-দুটি ছবি একটু ভিন্ন কোণ থেকে নেয়া। প্রায় একরকম হয়েও যেন একরকম নয়। তারেক বিজয়ীর মুখভঙ্গি করে বলল, "দেখলেন স্যার? দেখলেন?"

"কী?"

"যে কাগজটা ভবিষ্যৎ থেকে এনেছি সেটা একটু অন্যরকম।"

প্রফেসর জোয়ারদার মাথা চুলকে বললেন, "তার মানে কী?"

"মানে বুঝতে পারছেন না?" তারেকের গলায় একটু অধৈর্য প্রকাশ পেয়ে যায়, "তার মানে এই খবরের কাগজটা এসেছে অন্য একটা জগৎ থেকে। আমি যেটা সন্দেহ করেছিলাম সেটাই সত্যি। এখানে পাশাপাশি অনেক জগৎ রয়েছে, প্রায় একই রকম কিন্তু পুরোপুরি একরকম নয়। সময় পরিভ্রমণ করে আমরা এক জগৎ থেকে অন্য জগতে চলে যাই।"

"তার মানে তুমি বলতে চাও ঠিক আমাদের মতো আরো জগৎ রয়েছে, সেখানে আমি আছি, তুমি আছ?"

"নিশ্চয়ই আছে স্যার।"

"তারাও এটা নিয়ে রিসার্চ করছে?"

"নিশ্চয়ই করছে।"

"তারাও ভবিষ্যৎ থেকে জিনিসপত্র টেনে নিতে চেষ্টা করছে?"

"নিশ্চয়ই করছে। মাঝে মাঝে আমরা টুকটাক জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলি, কে জানে সেসব হয়তো অন্য কোনো জগৎ নিয়ে যায়।"

"তুমি তাই মনে কর?"

"হতেই তো পারে! কোনদিন না আবার আমাদের টেনে নিয়ে যায়!" তারেক শব্দ করে হাসতে থাকে।

৪

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার ঠিক করলেন পাশাপাশি থাকা জগতের অস্তিত্ব নিয়ে তাদের হাতে যে প্রমাণটা রয়েছে সেটা প্রকাশ করার জন্যে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন। সবার সামনে খামটা খোলা হবে, দেখানো হবে দুদিন আগে কীভাবে খবরের কাগজটি চলে এসেছে। তার চেয়ে বড় কথা খবরের কাগজটির মাঝে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। ভবিষ্যৎ থেকে টেনে আনার চাইতেও এই পার্থক্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। এটা প্রমাণ করে ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব।

সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার আগে প্রফেসর জোয়ারদার তারেকের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি বুঝে নিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে হঠাৎ করে কেউ কিছু প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত না করে ফেলতে পারে সেটা নিয়ে সতর্ক রইলেন। যন্ত্রপাতি কীভাবে চালায়, কীভাবে বন্ধ করে বারবার করে দেখে নিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের আগের রাতে প্রফেসর জোয়ারদার আবার ল্যাবরেটরিতে এসে শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নিচ্ছেন। সুইচ টিপে ভবিষ্যৎ থেকে কোনো কিছুকে অতীতে টেনে আনার জটিল যন্ত্রটি চালু করার সময় হঠাৎ তার মাথায় একটা বিচিত্র সম্ভাবনার কথা মনে হল, তিনি কি কোনোভাবে তারেককে খুন করে ফেলতে পারেন না? এই যে বিশাল কাজটি, একটা আবিষ্কার তার সম্মানটুকু পুরোপুরিই তার কাছে আসছে, কিন্তু যতদিন তারেক বেঁচে থাকবে এর ভিতটি হবে খুব নড়বড়ে। যদি তাকে কোনোভাবে শেষ করে দেয়া যায় পৃথিবীতে আর কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।

প্রফেসর জোয়ারদার জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন। তিনি লোভী এবং দুর্বল চরিত্রের মানুষ, মানুষ খুন করার মতো শক্তি বা সাহস তার নেই। বিশ্বজোড়া আবিষ্কারের এই সম্মানটুকু সারাক্ষণ তাকে ভয়ে ভয়েই উপভোগ করতে হবে।

প্রফেসর জোয়ারদার সুইচটা অন করতেই ঘরঘর শব্দ করে বহুকোণ একটা অংশে ভ্যাকুয়াম পাম্প চালু হয়ে যায়। উচ্চচাপের বিদ্যুতে বিশাল একটা অংশ আয়োনিত করে সেখানে অনেকগুলি লেজার রশ্মি খেলা করতে থাকে। রেডিয়েশান মনিটরে অল্পশক্তির এক্স-রে ধরা পড়ে এক ধরনের ভোঁতা ধাতব শব্দ করতে থাকে। প্রফেসর জোয়ারদার একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, তিনি চমকে তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলেন। হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল এবং প্রফেসর জোয়ারদারের মনে হল তিনি শূন্যে ছিটকে পড়ে গেছেন। হাত দিয়ে তিনি ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ধরার কিছু নেই-অতল শূন্যে পড়ে যাচ্ছেন। বিকট গলায় তিনি চিৎকার করতে থাকেন, মনে হল তার গলার আওয়াজ অদৃশ্য কোনো এক জগতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার চোখ খুলে দেখলেন তার উপর ঝুঁকে উবু হয়ে একজন মানুষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। মানুষটির চেহারা দেখে তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, মানুষটি তিনি নিজে।

"তু-তু-তুমি কে?"

"আমি হচ্ছি তুমি। অন্য জগৎ থেকে তুমি এখানে আমার কাছে চলে এসেছ। আমি ছোটখাটো জিনিস টেনে আনতে চাচ্ছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছে বড় জিনিস পেয়ে গেছি। আস্ত

একজন মানুষ, আর যে-সে মানুষ নয়—একেবারে নিজেকে।"

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার নিজের ভিতরে এক ধরনের অসহনীয় আতংক অনুভব করতে থাকেন। শুকনো গলায় বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না।"

মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "না বোঝার কিছু নেই এখানে, তুমি তো আমি। আমি যদি বুঝি, তুমি বুঝবে না কেন?"

"তারেক—তারেক কোথায়?"

"ঐ যে। মেঝেতে পড়ে আছে। হাই টেনশান তার এসে লেগেছে হঠাৎ—হার্টবিট বন্ধ হয়ে মরে গেছে।"

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার তীক্ষ্ণ চোখে তার নিজের মতো মানুষটির দিকে তাকালেন, হঠাৎ করে তিনি বুঝতে পারলেন এই জগতের প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার তার মতো ভীরু কাপুরুষ নয়, সে ঠাণ্ডা মাথায় তারেককে খুন করে ফেলেছে। তিনি শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে বললেন, "তুমি তারেককে খুন করেছ?"

মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "কী বলছ তুমি পাগলের মতো? প্রমাণ আছে কোথাও?"

প্রফেসর জোয়ারদার মাথা নাড়লেন, বললেন, "না প্রমাণ নেই।"

মানুষটি উঠে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি অন্য জগৎ থেকে এসেছ—মানুষটা আমি হলেও তুমি পুরোপুরি আমি নও। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"তুমি উল্টোপাল্টা কথা বলে ঝামেলা করতে পার।"

"কী ঝামেলা?"

প্রফেসর কাসেম জোয়ারদার দেখলেন মানুষটি হাতে একটা লোহার রড তুলে নিয়ে বলল, "অন্য কোনো জগৎ থেকে যদি আমি নিজেকে টেনে আনতে পারি এক-দুইটা নোবেল প্রাইজের জন্য সেটাই যথেষ্ট। তাকে জীবন্ত টেনে আনতে হবে কে বলেছে! কী বল তুমি?"

প্রফেসর জোয়ারদার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তার নিজের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আইনস্টাইন

ফ্রেডি তার সামনে বসে থাকা মানুষটিকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। মানুষটি আকারে ছোট, মাথার চুল হালকা হয়ে এসেছে, গোসল সেরে খুব সতর্কভাবে চুল আঁচড়ালে যে কয়টি চুল আছে সেগুলি দিয়ে মোটামুটিভাবে মাথাটা ঢাকা যায়। মানুষটির চেহারায় একটি তৈলাক্ত পিচ্ছিল ভাব রয়েছে, মুখের চামড়া এখনো কুঁচকে যায় নি বলে প্রকৃত বয়স ধরা যায় না, চোখ দুটি ধূসর এবং সেখানে কেমন জানি এক ধরনের মৃত-মানুষ মৃত-মানুষ ভাব রয়েছে। মানুষটির স্যুটটি দামি, টাইটি রুচিসম্মত, কাপড় নিভাঁজ। চেহারা দেখে কখনো কোনো মানুষকে বিচার করা ঠিক নয়, কিন্তু তবুও ফ্রেডি মানুষটিকে অপছন্দ করে

ফেললেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে তার কথা শোনার ভান করতে থাকেন যদিও, তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে মানুষটির কথা বলার ভঙ্গিতে, ঠোঁট কুঁচকে ওঠায়, দাঁত বের হওয়ার মাঝে।

"আপনি পৃথিবীর প্রথম দশ জন ঐশ্বর্যশালী মানুষের এক জন।" মানুষটি মুখে এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি জানি আপনার সাথে দেখা করার থেকে একজন মন্ত্রীর স্ত্রীর সাথে ফষ্টিনষ্টি করা সহজ—তবুও আমাকে খানিকটা সময় দিয়েছেন বলে অনেক ধন্যবাদ। তবে আমি নিশ্চিত—আপনি শুধু শুধু আমার সাথে খানিকটা সময় ব্যয় করতে রাজি হন নি। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছেন, আমার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন—"

ফ্রেডি গ্রানাইটের কালো টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করছিল, হঠাৎ করে সেটা বন্ধ করে মানুষটিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কাজের কথায় আসা যাক।"

মানুষটি এতটুকু বিচলিত না হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আসা যাক।"

"আপনি দাবি করছেন আমার টাকা বিনিয়োগের এর থেকে বড় সুযোগ আর কোথাও নেই?"

"না, নেই।" ছোটখাটো মানুষটির গলার স্বর যে আনুনাসিক হঠাৎ করে সেটা কেমন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"আপনি কেমন করে এত নিশ্চিত হলেন? আমি কোথায় কোথায় টাকা বিনিয়োগ করেছি আপনি জানেন?"

"মোটামুটিভাবে জানি। সেজন্যেই অন্য কারো কাছে যাবার আগে আপনার কাছে এসেছি।"

ফ্রেডি ভুরু কুঁচকালেন, "মানে?"

"পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর নাম শোনে নি তখন আপনি সান হোসের সবচেয়ে বড় এ. আই. ফার্মটি কিনেছেন। নিউক্লিয়ার পাওয়ার যে পৃথিবী থেকে উঠে যাবে সেটি অন্যেরা বোঝার অন্তত দশ বছর আগে আপনি বুঝেছিলেন। প্রচুর অর্থ নষ্ট করে আপনি সেখান থেকে সরে এসে কয়েক বছরের মাঝে আপনার বিশাল সম্পদকে রক্ষা করেছেন। স্পেস সায়েন্সে মোটা টাকা লোকসান দিয়ে আপনি সেটাকে দশ বছর ধরে রাখলেন—এখন সারা পৃথিবীতে আপনার একচ্ছত্র মনোপলি। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে আপনি পৃথিবীর সবচয়ে বড় বিনিয়োগটি করতে যাচ্ছেন। জেনেভার সবচেয়ে বড় জিনেটিক ল্যাবটিতে আপনি বিভ করেছেন—"

ফ্রেডি সোজা হয়ে বসলেন, "আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।" মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "কেমন করে জানি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

"ব্যাপারটা গোপন থাকার কথা।"

"ব্যাপারটা এখনো গোপনই আছে। আমি জানলেও তথ্য গোপন থাকে বলে আমি অনেক তথ্য জানতে পারি।"

ফ্রেডি আবার তার আঙুল দিয়ে অন্যমনস্কভাবে টেবিলে টোকা দিতে শুরু করলেন, বললেন, "ঠিক আছে, এখন তুমি বল আমি কিসে বিনিয়োগ করব?"

"মানুষে।"

"মানুষে!"

"হ্যাঁ মানুষে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হবে মানুষে। সত্যিকার মানুষে। রক্তমাংসের মানুষে।"

ফ্রেডি কোনো কথা না বলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষটি মাথা এগিয়ে এনে ষড়যন্ত্রীদের মতো বলল, "হেঁজিপেজি মানুষে নয়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে।"

ফ্রেডি মাথা নাড়লেন, "আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

ছোটখাটো তৈলাক্ত চেহারার মানুষটি একটি ম্যাগাজিন ফ্রেডির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা দেখেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।"

ফ্রেডি ম্যাগাজিনটি হাতে নিলেন, পুরোনো একটি নিউজউইক। যে লেখাটি দেখতে দিয়েছে সেটা লাল কালি দিয়ে বর্ডার করে রাখা। ফ্রেডি চোখে চশমা লাগিয়ে লেখাটি পড়লেন, জেনেভার একটি ল্যাবরেটরিতে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের খানিকটা টিস্যু সংরক্ষিত ছিল, সেটি খোয়া গেছে। জোর পুলিশি তদন্ত চলছে।

ফ্রেডি কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে লেখাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তিনি বেশ কয়েক বছর আগে এই সংবাদটি পড়েছিলেন, কেন এই টিস্যু খোয়া গেছে তিনি সাথে সাথে বুঝতে পেরেছিলেন। এখন এই তৈলাক্ত পিচ্ছিল চেহারার মানুষটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পুরো ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দ্রুততর হয়ে যায়। তিনি খুব সতর্কভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন?"

"আপনি যদি বুঝতে না পারেন আমার কিছু বলার কোনো অর্থ নেই। আর আপনি যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার কোনো প্রয়োজন নেই।"

ফ্রেডি তীক্ষ্ণ চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আপনি—আপনি বলতে চাইছেন আইনস্টাইনকে ক্লোন করা হয়েছে?"

ছোটখাটো মানুষটির মুখে একটি তৈলাক্ত হাসি বিস্তৃত হল। মাথা নেড়ে বলল, "আপনি যথার্থ অনুমান করেছেন। আইনস্টাইনকে ক্লোন করা হয়েছে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তাকে মাতৃগর্ভে ঠিকভাবে বসানো হয়েছে?"

মানুষটির মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল, বলল, "সে অনেকদিন আগের কথা।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আইনস্টাইনের ক্লোনের জন্ম হয়ে গেছে?"

"অবশ্যি। যদি সুস্থভাবে জন্ম না হত আমি কি আপনার কাছে আসতাম?"

"কোথায় জন্ম হয়েছে? কবে জন্ম হয়েছে?"

"এই দেশেই জন্ম হয়েছে। প্রায় বছর চারেক হল।"

"কোথায় আছে সেই ক্লোন?"

ছোটখাটো মানুষটি খুব ধীরে ধীরে মুখের হাসি মুছে সেখানে একটি গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে বলল, "সেই শিশুটি কোথায় আছে আমি বলতে পারব না। বুঝতেই পারছেন নিরাপত্তার ব্যাপার রয়েছে। যেটুকু বলতে পারি সেটা হচ্ছে সে তার সারোগেট মায়ের সাথে আছে। অনেক খুঁজে পেতে এই মা'কে বেছে নেয়া হয়েছে, অর্ধেক জার্মান এবং অর্ধেক সুইস। অত্যন্ত মায়াবতী মহিলা।"

ফ্রেডি তখনো ঠিক ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, খানিকটা হতচকিতের মতো ছোটখাটো মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষটি তার বুকপকেট থেকে দুটি ছবি বের করে ফ্রেডির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে আইনস্টাইনের শৈশবের ছবি। একটি নিয়েছি এন্টনিয়া ভেলেন্টিনের লেখা বই থেকে। অন্যটি সপ্তাহখানেক আগে তোলা।"

ফ্রেডি হতবাক হয়ে ছবি দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আইনস্টাইনের শৈশবের ছবির সাথে কোনো পার্থক্য নেই, সেই ভরাট গাল, কোঁকড়া চুল, গভীর মায়াবী চোখ! পার্থক্য কেমন করে থাকবে? আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের টিস্যু থেকে একটা কোষ আলাদা করে তার ছেচল্লিশটি ক্রমোজম একটি মায়ের ডিম্বাণুতে ঢুকিয়ে সেটি মাতৃগর্ভে বসানো হয়েছে। যে ক্রমোজমগুলি একটি ডিম্বাণু থেকে আইনস্টাইনের জন্ম দিয়েছে সেই একই ক্রমোজম এই আইনস্টাইনের জন্ম দিয়েছে। যে শিশুটির জন্ম হয়েছে সে তো আইনস্টাইনের মতো একজন নয়, সে সত্যি সত্যি আইনস্টাইন।

ছোটখাটো মানুষটি ছবি দুটি নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপনাকে নিশ্চয়ই এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

ফ্রেডি কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, খানিকক্ষণ পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "আটানব্বই সালে আইন করে সারা পৃথিবীতে মানুষের ক্লোন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

মানুষটি মুখ নিচু করে খিকখিক করে হেসে বলল, "অবশ্যই কাজটা বেআইনি। নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে অন্তর্ঘাত চালিয়ে ব্যবসা থেকে উঠিয়ে দেয়াও বেআইনি ছিল। আভ্যন্তরীণ খবর কিনে স্যাটেলাইট সিস্টেম পুরোটা দখল করে নেয়াও বেআইনি ছিল, কিন্তু আপনি সেজন্যে নিরুৎসাহিত হন নি। জেনেভার জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ফার্ম আপনি যেভাবে কিনতে যাচ্ছেন সেটাও পুরোপুরি বেআইনি। আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী মানুষদের এক জন, আপনার তো আইনকে ভয় পাওয়ার কথা নয়—আপনার আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা।"

"আমি আইনকে ভয় করি না, কারণ পৃথিবীর কোথাও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না আমি আইন ভঙ্গ করেছি।"

ছোটখাটো মানুষটি মুখের হাসি বিস্তৃত করে বলল, "আপনাকে আমি একবারও আইন ভঙ্গ করতে বলি নি। ল্যাবরেটরি থেকে টিস্যু সরিয়ে যে আইনস্টাইনকে ক্লোন করেছে সে আইন ভেঙেছে। একবার ক্লোনের জন্ম হওয়ার পর সে পৃথিবীর মানবশিশু—কারো সাধ্যি নেই তাকে স্পর্শ করে। আপনি শুধুমাত্র তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন—সেটি হবে পুরোপুরি আইনের ভিতরে। তারপর তাকে আপনি কীভাবে বাজারজাত করবেন সেটি পুরোপুরি আপনার ব্যাপার!" মানুষটি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আমার ধারণা একবিংশ শতাব্দীতে কীভাবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানীকে ব্যবহার করা যাবে সেটি আপনার চাইতে ভালো করে আর কেউ জানে না।"

ফ্রেডি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। ভবিষ্যৎ-মুখী বিনিয়োগে, সারা পৃথিবীতে তার কোনো জুড়ি নেই, সত্যি সত্যি এ ব্যাপারে তার প্রায় এক ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে। যদিও মানুষকে ক্লোন করার ব্যাপারটি বেআইনি, কিন্তু এটি যে অসংখ্যবার ঘটেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষকে ক্লোন করে তার দ্বিতীয় তৃতীয় কিংবা অসংখ্য কপি তৈরি করে সত্যিকার অর্থে পৃথিবীর কোনো লাভ-ক্ষতি হয় নি। তবে আইনস্টাইনের মতো একজন মানুষের বেলায় সেটি অন্য কথা, এটি পৃথিবীর সমস্ত ভারসাম্যের ওলটপালট করে দিতে পারে। জেনারেল রিলেটিভিটির যে সমস্ত সমস্যার এখনো সমাধান হয় নি তার বড় একটা যদি সমাধান করিয়ে নেয়া যায় তাহলে কী সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হবে! মানুষ আইনস্টাইনকে দেখেছে পরিণত বয়সে, কৈশোরের আইনস্টাইন, যৌবনের আইস্টাইন নিয়ে সাধারণ মানুষের নিশ্চয়ই কী সাংঘাতিক কৌতূহল!

ঠিকভাবে বাজারজাত করা হলে এখান থেকে কী হতে পারে তার কোনো সীমা নেই। যদি এই ক্লোন থেকে আরো ক্লোন করা যায় দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জন করে আইনস্টাইন দেয়া যায়—ফ্রেডি আর চিন্তা করতে পারেন না, তার ব্যবসায়ী মস্তিষ্ক হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চোখ খুলে তিনি ছোটখাটো মানুষটির দিকে তাকালেন, "কত?"

মানুষটির মুখে আবার তৈলাক্ত হাসিটি বিস্তৃত হল, বলল, "অর্থের পরিমাণটি তো গুরুত্বপূর্ণ নয়—আপনি রাজি আছেন কি না সেটি গুরুত্বপূর্ণ।"

"তবু আমি শুনতে চাই। কত?"

"মানুষের বিনিয়োগের ব্যাপারটি কিন্তু আপনাকে দিয়েই শুরু হবে। আমি যতদূর জানি এলভিস প্রিসলি, মেরিলিন মনরো এবং উইনস্টন চার্চিলের ক্লোন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেগুলি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে, হঠাৎ করে মারা গেলে কীভাবে ইন্স্যুরেন্স করা হবে তার সবকিছু কিন্তু এইটি দিয়ে ঠিক করা হবে।"

ফ্রেডি মাথাটা একটু এগিয়ে এনে বললেন, "আপনি এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কত?"

মানুষটি তার জিব বের করে ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে বলল, "আমরা খোঁজ নিয়েছি, সাদা এবং কালো মিলিয়ে আপনার সেই পরিমাণ লিকুইড ক্যাশ রয়েছে।"

ফ্রেডি একটা নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলেন, তারপর থমথমে গলায় বললেন, "ঠিক আছে, আমার এটর্নি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার জন্যে আপনার এটর্নির সাথে যোগাযোগ করবে। তবে—"

"তবে?"

"এটি যে সত্যিই আইনস্টাইনের ক্লোন এবং আন্তর্জাতিক কোনো জোচ্চুরির অংশ নয় সেটি আমি নিজেই নিশ্চিত হয়ে নেব। মাউন্ট সাইনাই হাসপাতাল থেকে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের টিস্যু সংগ্রহ করে আমি নিজে আমার নিজের জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নেব।"

"অবশ্যি। আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করবেন তার জন্যে এটি তো করতেই হবে।" ছোটখাটো মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে খানিকক্ষণ সময় দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত আজকে এখান থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।"

ফ্রেডি কোনো কথা না বলে শীতল চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * * * * *

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইনের ক্লোনশিশুটি চুপচাপ ধরনের—ঠিক যেরকম হওয়ার কথা। শিশুটি কথা বলে মৃদু স্বরে—তার সাথে যে সারোগেট মা রয়েছেন তার কাছে জানা গেল, শিশুটি কথা বলতে শুরু করেছে অনেক দেরি করে, ঠিক সত্যিকার আইনস্টাইনের মতো।

শিশুটির নাম দেয়া হয়েছে এলবার্ট—খুব সঙ্গত কারণেই। ফ্রেডি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার পর একদিন শিশুটিকে দেখতে গিয়েছিলেন, বাচ্চাটি তার কাছেই এল না, দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রেডি ভাব করার খুব বেশি চেষ্টা করলেন না, তার জন্যে প্রায় পুরো জীবনটাই পড়ে রয়েছে। শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার ভিতরে বিচিত্র এক ধরনের ভাব খেলা করতে থাকে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবার্ট

আইনস্টাইনকে তিনি সংগ্রহ করেছেন। তার ছবি নয়, তার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি নয়, তার ব্যবহার্য পোশাক নয়—স্বয়ং মানুষটিকে। পৃথিবীর ইতিহাসে কি এর আগে কখনো এরকম কিছু ঘটেছে? মনে হয় না। এই আইনস্টাইনকে তিনি গড়ে তুলবেন। প্রকৃত আইনস্টাইন তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে যে কাজ করতে পারেন নি তিনি এই শিশুকে দিয়ে সেইসব করিয়ে নেবেন। শুধু অর্থ নয়, খ্যাতি এবং ইতিহাস সৃষ্টি করবেন এই শিশুটিকে দিয়ে।

ফ্রেডি শিশুটিকে চমৎকার একটা পরিবেশে বড় হওয়ার জন্যে যা যা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। শহরতলিতে একটা ছবির মতো বাসা, পিছনে একটা ঝিল, ঝিলের পাশে পাইন গাছ। ঘরের ভিতরে ফায়ারপ্লেস, বড় লাইব্রেরি, বসার ঘরে গ্র্যান্ড পিয়ানো, চমৎকার উজ্জ্বল রঙে সাজানো শোয়ার ঘর, পায়ের কাছে খেলনার বাক্স, মাথার কাছে সুদৃশ্য কম্পিউটার।

শিশুটি চমৎকার পরিবেশে বড় হতে থাকে। তার মানসিক বিকাশলাভের প্রক্রিয়াটি খুব তীক্ষ্ণ নজরে রাখা হল। প্রকৃত আইনস্টাইনের মতোই তার পড়াশোনায় খুব মন নেই। এলজেবরা বা জ্যামিতি দুই-ই চোখে দেখতে পারে না। কম্পিউটারের নূতনত্বটুকু কেটে যাবার পর সেটিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। সঙ্গীতে অবশ্যি এক ধরনের আকর্ষণ গড়ে উঠল, একা একা দীর্ঘ সময় গ্র্যান্ড পিয়ানো টেপাটেপি করে, মনে হয় এইটুকু বাচ্চার ভিতরে প্রচণ্ড এক ধরনের সুরবোধ রয়েছে।

শিশুটির ভিতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা রয়েছে, স্কুলে বন্ধুবান্ধব খুব বেশি নেই। ফ্রেডি খুব মনোযোগ দিয়ে এই শিশুটিকে লক্ষ করে যাচ্ছে, খুব সাধারণ একটা শিশু হিসেবে বড় হবে সে, বয়ঃসন্ধির সময় হঠাৎ করে মানসিক বড় বড় কিছু পরিবর্তন ঘটবে। ফ্রেডি খুব ধৈর্য ধরে সেই সময়টির জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ এটি—প্রয়োজনে তার জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করবেন।

* * * * * *

তরুণ এলবার্ট গ্র্যান্ড পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ফ্রেডি কাছাকাছি একটা নরম চেয়ারে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছেন। এন্টোনিয়া ভেলেন্টাইনের বইয়ে তরুণ আইনস্টাইনের যে ছবিটি রয়েছে তার সাথে এই তরুণটির একচুল পার্থক্য নেই। সেই অবিন্যস্ত ব্যাকব্রাশ করা চুল, উঁচু কপাল, সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা—ঠোঁটের কোনায় এক ধরনের হাসি যেটা প্রায় বিদ্রূপের কাছাকাছি। ছবিটিতে আইনস্টাইন থ্রিপিস স্যুট পরে ছিলেন—সেই যুগে যেরকম চল ছিল, এলবার্ট একটা জিন্সের প্যান্ট এবং গাঢ় নীল রঙের টি-শার্ট পরে আছে—এইটুকুই পার্থক্য।

ফ্রেডি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এলবার্ট আমি আজকে তোমার সাথে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই কথাটি বলার জন্যে এক যুগ থেকেও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করে আছি।"

এলবার্ট উৎসুক দৃষ্টিতে ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রেডি বললেন, "তুমি আমার কাছে বস।"

এলবার্ট এগিয়ে এসে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল, তার চোখেমুখে হঠাৎ এক ধরনের সূক্ষ্ম অসহিষ্ণুতার ছাপ পড়ে। ফ্রেডি ভুরু কুঁচকে বললেন, "কোনো সমস্যা?"

'না, ঠিক সমস্যা নয়। তবে—"

"তবে?"

"আজ বিকেলে আমার জুডিকে নিয়ে একটা কনসার্টে যাবার কথা।"

"কনসার্ট? কিসের কনসার্ট?"

"ট্রায়ো ইন দ্য ওয়াগন।"

ফ্রেডি চোখ কপালে তুলে বললেন, "মাই গড! তুমি ঐসব কনসার্টে যাও? আমি ভেবেছিলাম—"

এলবার্ট সাথে সাথে কেমন যেন আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গি করে বলল, "কী ভেবেছিলে?"

"না, কিছু না।"

ফ্রেডি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। খানিকক্ষণ খুব যত্ন করে নিজের নখগুলি পরীক্ষা করেন, তারপর এলবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি জান তুমি কে?"

এলবার্ট অবাক হয়ে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি—আমি এলবার্ট।"

"তুমি অবশ্যি এলবার্ট। কিন্তু তুমি কি জান তুমি কোন এলবার্ট?"

এলবার্ট অনিশ্চিতের মতো মাথা নাড়ল, দেখে মনে হল সে প্রশ্নটা বুঝতে পারে নি।

ফ্রেডি একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "তুমি এলবার্ট আইনস্টাইন।"

এলবার্ট কথাটিকে একটা রসিকতা হিসেবে নিয়ে হেসে উঠতে গিয়ে ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। বিভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

"তুমি বুঝতে পেরেছ, বিশ্বাস করতে পারছ না। তাই না?"

"না, মানে—"

"হ্যাঁ। তুমি ভুল শোন নি, আমিও ভুল বলি নি। তুমি সত্যি সত্যি এলবার্ট আইনস্টাইন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইন।"

এলবার্ট অসহিষ্ণুভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

ফ্রেডি একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "বুঝতে পারবে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বুঝতে পারে না এরকম বিষয় খুব বেশি নেই। তুমি নিশ্চয়ই ক্লোন কথাটির অর্থ জান?"

এলবার্টের মুখমণ্ডল হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে যায়, "ক্লোন?"

"হ্যাঁ, ক্লোন। যেখানে মানুষের একটিমাত্র কোষ থেকে ছেচল্লিশটি ক্রোমোজম নিয়ে পুরো মানুষটিকে হুবহু জন্ম দেয়া যায়।"

"জানি।" এলবার্ট মাথা নাড়ল, "আমি ক্লোন সম্পর্কে জানি। আমাদের পড়ানো হয়।"

"তুমি সেরকম একটি ক্লোন। জেনেভার এক ল্যাবরেটরি থেকে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের টিস্যু চুরি করে নিয়ে তোমাকে তৈরি করা হয়েছিল। তুমি এবং মহাবিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইন একই ব্যক্তি।"

"মিথ্যা কথা।" এলবার্ট মাথা নেড়ে বলল, "বিশ্বাস করি না আমি। বিশ্বাস করি না।"

ফ্রেডি শীতল গলায় বললেন, "তুমি বিশ্বাস না করলেও কিছু আসে যায় না এলবার্ট। ব্যাপারটি সত্যি। আমার কাছে সব প্রমাণ আছে—তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি। এই দেখ—"

ফ্রেডি তার পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে এলবার্টের হাতে দিলেন, বললেন, "জিনেটিক ব্যাপারগুলি বোঝা খুব সহজ নয়—কিন্তু তুমি আইনস্টাইন, পৃথিবীতে তোমার মতো মস্তিষ্ক একটিও নেই। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। দেখ।"

এলবার্ট কাঁপা হাতে কাগজগুলি নিয়ে খানিকক্ষণ দেখল, যখন মুখ তুলে তাকাল তখন তার মুখ রক্তহীন। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "অসম্ভব।"

"না। অসম্ভব না। তুমি সত্যিই এলবার্ট আইনস্টাইন।"

"না।" এলবার্ট চিৎকার করে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

"তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে এলবার্ট। তুমি সত্যিই এলবার্ট আইনস্টাইন। আমি প্রায় বিলিয়ন ডলার দিয়ে তোমার অভিভাবকত্ব নিয়েছি এলবার্ট। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।"

"বিনিয়োগ? আমি বিনিয়োগ?"

"হ্যাঁ। আমাকে সেই বিনিয়োগের পুরোটুকু ফেরত আনতে হবে। আমাদের অনেক কাজ বাকি এলবার্ট।"

এলবার্ট এক ধরনের আতংক নিয়ে ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে রইল, কাঁপা গলায় বলল, "আমাকে? আমাকে সেই ট্রিলিয়ন ডলার আনতে হবে?"

ফ্রেডি হাত তুলে বললেন, "না, তোমাকে আনতে হবে না, সেটা আনব আমি। তোমাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"নূতন কিছুই না। তুমি যা তোমাকে তাই হতে হবে। তুমি এলবার্ট আইনস্টাইন—তোমাকে এলবার্ট আইনস্টাইন-ই হতে হবে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে হবে, গণিত নিয়ে ভাবতে হবে—গবেষণা করতে হবে, চিন্তা করতে হবে।"

"কিন্তু কিন্তু—" এলবার্ট কাতর গলায় বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না। আমি এলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী পড়েছি। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ—আমি সেরকম কিছু নই। আমি সাধারণ, খুব সাধারণ—"

"না, তুমি সাধারণ নও। তোমার মস্তিষ্ক হচ্ছে এলবার্ট আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক। এতদিন তুমি জানতে না, তাই ভাবতে তুমি সাধারণ। এখন তুমি জান। এখন তুমি হয়ে উঠবে সত্যিকারের আইনস্টাইন। যে সমীকরণ আইনস্টাইন শেষ করতে পারেন নি তুমি সেটা শেষ করবে।"

"না।"

ফ্রেডি অবাক হয়ে বলল, "না!"

"না। আমার গণিত ভালো লাগে না। পদার্থবিজ্ঞান ভালো লাগে না।"

ফ্রেডি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "পদার্থবিজ্ঞান ভালো লাগে না? তুমি আইনস্টাইন, তোমার পদার্থবিজ্ঞান ভালো লাগে না?"

"না। আমি সেই আইনস্টাইন নই। আমি সেই সময়ে বড় হই নি। তখন পদার্থবিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, আইনস্টাইন উৎসাহ পেয়েছেন। এখন পদার্থবিজ্ঞানে কোনো বড় আবিষ্কার হচ্ছে না, পুরো ব্যাপারটা একটা বন্ধঘরের মতো।"

"কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি। আমি গণিতেও কোনো মজা পাই না। যখন গণিতের কোনো সমস্যা দেয়া হয় আমি সেটা কম্পিউটারে করে ফেলি। তুমি জান, গণিতের সমস্যা সমাধানের জন্যে কত মজার মজার সফটওয়ার প্যাকেজ আছে? এলজেবরা করতে পারে, ক্যালকুলাস করতে পারে, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সমাধান করতে পারে। অঙ্ক করার জন্যে আজকাল কিছু করতে হয় না। চিন্তা করতে হয় না, ভাবতে হয় না!"

"চিন্তা করতে হয় না? ভাবতে হয় না?"

"না। সত্যিকারের আইনস্টাইনের তো কম্পিউটার ছিল না, তার সবকিছু ভাবতে হত। ভেবে ভেবে অঙ্ক করতে করতে তার গণিতে উৎসাহ হয়েছিল, তাই তিনি গণিতে এত আনন্দ পেতেন, পদার্থবিজ্ঞানে আনন্দ পেতেন। আমি তো পাই না।"

"কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি। আইনস্টাইনের ক্লোন হলেই আইনস্টাইন হওয়া যায় না। আইনস্টাইনের মতো ভাবতে হয়!"

ফ্রেডি প্রায় ভাঙা গলায় বলল, "তুমি আইনস্টাইনের মতো ভাবতে পার না?"

"না। আমার ভালো লাগে না। আমি ওসব ভেবে আনন্দ পাই না।"

"তুমি কিসে আনন্দ পাও?"

এলবার্টের চোখেমুখে এক ধরনের উজ্জ্বলতা এসে ভর করে। সে চোখ বড় বড় করে বলল, "সঙ্গীতে।"

"সঙ্গীতে?"

"হ্যাঁ। হাইস্কুলে আমি সঙ্গীতের ওপর মেজর করেছি। আমি সঙ্গীতের ওপর পড়াশোনা করতে চাই।"

"সঙ্গীতের ওপর?" ফ্রেডি মুখ হাঁ করে বলল, "সঙ্গীতে?"

"হ্যাঁ।" এলবার্ট হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন? তুমি জান না আসল আইনস্টাইনও খুব বেহালা বাজাতে পছন্দ করতেন? বেলজিয়ামের রানীর সাথে তিনি সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেছেন।"

"কিন্তু—"

"আজকাল কী চমৎকার সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে, ডিজিটাল সাউন্ড, কী চমৎকার তার সুর! আমি নিশ্চিত, আইনস্টাইনের যদি ওরকম একটা সাউন্ড সিস্টেম থাকত তাহলে তিনি দিনরাত সেটা কানে লাগিয়ে বসে থাকতেন! গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান থেকে সঙ্গীত অনেক বেশি আনন্দের।"

"কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তো সঙ্গীতজ্ঞ আইনস্টাইন চায় না। তারা চায় বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে।"

"পৃথিবীর মানুষ চাইলে তো হবে না। আমাকেও চাইতে হবে। আইনস্টাইনের জন্ম হয়েছিল, তার কাজ করে গেছেন, এখন দ্বিতীয়বার আর তার জন্ম হবে না। আমি আইনস্টাইনের ক্লোন হতে পারি কিন্তু আমি আইনস্টাইন না। আমি বড় হয়েছি অন্যভাবে, আমার শখ ভিন্ন, আমার স্বপ্ন ভিন্ন। আমি কেন আইনস্টাইন হওয়ার এত বড় দায়িত্ব নিতে যাব? আমি সাধারণ মানুষের মতো থাকতে চাই!"

ফ্রেডি উঠে দাঁড়িয়ে এলবার্টের কাছে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু তুমি তো সাধারণ মানুষ নও। তুমি সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে খ্যাতিমান মানুষ। মানুষ খ্যাতির পিছনে ছোটে কিন্তু খ্যাতি খুঁজে পায় না। অর্থ হয় বিত্ত হয় ক্ষমতা হয় প্রতিপত্তি হয়—কিন্তু খ্যাতি এত সহজে কাউকে ধরা দেয় না। তুমি সেই খ্যাতি নিয়ে জন্মেছ। মানুষ যখন জানবে তুমি আসলে আইনস্টাইন—"

"না!" এলবার্ট চিৎকার করে বলল, "মানুষ জানবে না!"

ফ্রেডি অবাক হয়ে বলল, "কেন জানবে না? আমি বিলিয়ন ডলার খরচ করে তোমাকে এনেছি, তোমাকে মানুষের সামনে—"

"না, আমি চাই না।"

"চাও না?"

"না। আমার কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না।"

ফ্রেডি কাঁপা গলায় বলল, "বলতে পারব না?"

"না।"

ফ্রেডি কাঁপা গলায় বলল, "যদি বলি?"

"তাহলে আমি বলব সব জাল-জুয়াচুরি! কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

"বিশ্বাস করবে না?" ফ্রেডি হঠাৎ তার বুক চেপে সাবধানে চেয়ারে বসে পড়লেন, তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, বাম পাশে কেমন যেন ভোঁতা এক ধরনের ব্যথা দানা বেঁধে উঠছে। ফ্যাকাসে মুখে বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "ঠিকই বলেছ এলবার্ট। তোমার কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না। আইনস্টাইনকে কে অবিশ্বাস করবে?"

* * * * * *

মন্টানার একটি কমিউনিটি কলেজে এলবার্ট নামের যে সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন তাকে যে-ই দেখত সে-ই বলত, "আপনাকে কোথায় জানি দেখেছি বলতে পারেন?"

এলবার্ট নামের সেই সঙ্গীতশিক্ষক হেসে বলতেন, "কারো কারো চেহারাই এরকম—দেখলেই মনে হয় চেনা চেনা!"

যদি সঙ্গীতশিক্ষক তার চুল এবং গোঁফকে অবিন্যস্তভাবে বড় হতে দিতেন তাহলে কেন তাকে চেনা মনে হত ব্যাপারটি কারো বুঝতে বাকি থাকত না। কিন্তু তিনি কখনোই সেটা করেন নি।

ক্যাপ্টেন জুক

নিয়ন্ত্রণকক্ষের দেয়ালে লাগানো বড় মনিটরটির দিকে তাকিয়ে নিশির হঠাৎ নূতন করে মনে হল যে মহাকাশচারীর জীবন প্রকৃতপক্ষে খুব নিঃসঙ্গ হতে পারে। শৈশব এবং কৈশোরে মহাকাশ অভিযান নিয়ে নিশির এক ধরনের মোহ ছিল, প্রথম কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েই তার সেই মোহ কেটে যায়। সে আবিষ্কার করেছিল মহাকাশ অভিযান প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত কঠোর কিছু নিয়মকানুন দিয়ে বাঁধা অত্যন্ত কঠিন একটি জীবন। যদিও মহাকাশযানের বাইরে অসীম শূন্যতা, কিন্তু মহাকাশচারীদের থাকতে হয় ক্ষুদ্র পরিসরে। তাদের আপনজন যন্ত্র এবং যন্ত্রের কাছাকাছি কিছু মানুষ, তাদের বিনোদন অত্যন্ত জটিল কিছু যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের সঙ্গীত শক্তিশালী ইঞ্জিনের নিয়মিত গুঞ্জন। প্রথম কয়েকটি অভিযান শেষ করেই নিশি পৃথিবীর প্রচলিত জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে—তার অনুপস্থিতিতে পৃথিবীতে অর্ধ শতাব্দী কেটে গিয়েছে। তার পরিচিত মানুষের কেউ পৃথিবীতে নেই। যারা আছে তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন মনে হয় অপরিচিত, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি গেলে নিজেকে মনে হয় অনাহূত। পৃথিবীর জীবনকে নিশির মনে হয়েছে দুঃসহ, আবার তখন সে মহাকাশচারীর জীবনে ফিরে এসেছে।

নিশি জানে এই জীবনেই সে বাঁধা পড়ে গেছে, মহাকাশযানের শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুনতে শুনতে একদিন সে আবিষ্কার করবে তার চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে, মুখের চামড়ায় বয়সের বলিরেখা—দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। তখন মহাকাশচারীর পরীক্ষায় বাতিল হয়ে কোনো এক উপগ্রহের অবসরকেন্দ্রে কৃত্রিম জোছনাতে বসে বসে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। নিশি নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—ঠিক তখন তার পাশে লিয়ারা এসে বসেছে, সে নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের একজন পরিচালক। নিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী খবর নিশি? তুমি এতবড় একটি দীর্ঘশ্বাস কেন ফেললে?"

লিয়ারার প্রশ্ন শুনে নিশি হেসে ফেলল, বলল, "সাধারণ নিশ্বাসে অক্সিজেন যদি অপ্রতুল হয়, তখন দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রয়োজন। ব্যাপারটি একটি জৈবিক ব্যাপার, তুমি সত্যি যদি জানতে চাও শরীররক্ষা যন্ত্রের সাথে কথা বলতে পারি।"

লিয়ারা মাথা নেড়ে বলল, "মহাকাশচারী না হয়ে তোমার এটর্নি হওয়া উচিত ছিল।"

নিশি হেসে বলল, "ঠিকই বলেছ। এতদিনে তাহলে হয়তো কোনো একটা উপগ্রহ কিনে ফেলতে পারতাম। তোমার কী খবর বল?"

লিয়ারা হাসিমুখেই বলল, "খবর বেশি ভালো না।"

কেউ যদি হাসিমুখে বলে খবর ভালো নয় তাহলে সেটি খুব গুরুত্ব দিয়ে নেয়ার কথা নয়, নিশিও নিল না। বলল, "সব খবর যদি ভালো হয় জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়।"

"তোমার পক্ষে বলা খুব সহজ। তোমাকে তো আর মান্ধাতা আমলের একটা প্রোগ্রামকে পালিশ করতে হয় না। তুমি জান মূল সিস্টেমে দুটি চার মাত্রার ত্রুটি বের হয়েছে?"

"তাই নাকি?" নিশি হাসতে হাসতে বলল, "ভালোই তো হল। তোমরা কয়েকদিন এখন কাজকর্ম নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকবে।"

লিয়ারা চোখ পাকিয়ে বলল, "তুমি সত্যিই মনে কর আমরা এমনিতে কোনো কাজকর্ম করি না?"

নিশি হাত তুলে বলল, "না, না, না। আমি কখনোই সেটা বলি নি।"

লিয়ারা তার মনিটরে কিছু দুর্বোধ্য সংখ্যা প্রবেশ করাতে করাতে বলল, "তুমি সেটা হয়তো মুখে বল নি, কিন্তু সেটাই বোঝাতে চেয়েছ।"

নিশি এবারে শব্দ করে হেসে বলল, "লিয়ারা, তুমি লেখেছ, তোমার সাথে কথা বলা আজকাল কঠিন হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন?"

"আমি একটা জিনিস না বললেও তুমি ধরে নাও আমি সেটা বলতে চেয়েছি। কয়দিন পরে ব্যাপারটা হয়তো আরো গুরুতর হবে, কিছু একটা বলতে না চাইলেও তুমি ধরে নেবে আমি অবচেতন মনে সেটা বলতে চাই! আমি আগেই বলে রাখছি লিয়ারা, শুধুমাত্র যেটা আমি সচেতনভাবে করব তার দায়-দায়িত্ব আমি নেব।"

নিশির কথা শুনে লিয়ারা তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে নিশি হঠাৎ বুকের ভিতরে এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করে। লিয়ারা সম্ভবত সাদাসিধে একটি মেয়ে, তার কুচকুচে কালো চুল, বাদামি চোখ, মসৃণ ত্বক—সবই হয়তো খুব সাধারণ, কিন্তু তাকে দেখে সব সময়েই নিশি নিজের ভিতরে এক ধরনের ব্যাকুলতা অনুভব করে। মেয়েটির চেহারায়, কথা বলার ভঙ্গিতে বা চোখের দৃষ্টিতে কিছু একটা রয়েছে যেটি নিশিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। নিশি প্রাণপণ চেষ্টা করে তার মনের ভাবকে লিয়ারার কাছে গোপন রাখতে,

কিন্তু মানুষ অত্যন্ত রহস্যময় একটি প্রাণী, কিছু কিছু জিনিস না চাইলেও প্রকাশ হয়ে যায়। লিয়ারার কাছে সেটা প্রকাশ হয়ে থাকলে নিশি খুব অবাক বা অখুশি হবে না।

নিশি লিয়ারাকে আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন মনিটরে একটা লাল বাতি কয়েকবার জ্বলে উঠল এবং সাথে মহাকাশযানের দলপতি রুহানের অবিন্যস্ত চেহারাটি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে ভেসে ওঠে। রুহান বাম হাতে নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "নিশি, শুনেছ, কক্ষপথের কাছাকাছি একটা বিপদে পড়া মহাকাশযানের সিগনাল আসছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। চার মাত্রায় সংকেত।"

নিশি শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করে বলল, "সর্বনাশ! চার মাত্রা হলে তো অনেক বড় বিপদ!"

"হুঁ।" রুহান নির্মমভাবে তার পাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "অনেক বড় বিপদ।"

"কী করতে চাও এখন?"

রুহান দীর্ঘদিন থেকে মহাকাশে মহাকাশে সময় কাটিয়ে এসেছে বলেই কি না কে জানে সমস্ত জগৎসংসারের প্রতি তার একটা বিচিত্র উদাসীনতা জন্ম হয়েছে। সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী করতে চাই যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে বলব কিছু হয় নি এরকম ভান করে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে যেতে চাই।"

নিশি মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু সেটা তো করতে পারবে না। আসলে কী করবে?"

"কী করব যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে বলব আমাদের একটা স্কাউটশিপ পাঠাতে হবে।"

"স্কাউটশিপ?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে আমাকে যেতে হবে?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "স্কাউটশিপ নিয়ে ভরসা করতে পারি এই মহাকাশযানে সেরকম মানুষ তুমি ছাড়া আর কে আছে বল।"

নিশি একটা নিশ্বাস ফেলল। মহাকাশচারীর জীবনে এটাই হচ্ছে নিয়ম। বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি না নিয়ে বিশাল একটি দায়িত্ব নেয়া। অসংখ্যবার করে করে অভ্যাস হয়ে গেছে, আজকাল আর সে অবাকও হয় না।

রুহান বলল, "আমি জানি একেবারেই শুধু শুধু যাওয়া হচ্ছে, মহাকাশযানটিতে কেউ বেঁচে নেই।"

"কেমন করে জান?"

"যেসব সংকেত এসেছে তাতে মনে হচ্ছে এটা অক্ষের উপর ঘুরছে না অর্থাৎ ভেতরে কৃত্রিম মহাকর্ষ নেই। জীবিত মানুষ থাকলে মহাকর্ষ থাকবে না এটা তো হতে পারে না।"

"তা ঠিক।"

ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে নিশি প্রস্তুত হয়ে নেয়। বিধ্বস্ত মহাকাশযানটির কাছাকাছি যেতে কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মতো লেগে যাবে, ফিরে আসতে আরো চব্বিশ ঘণ্টা। মহাকাশচারীদের জীবনের জন্যে এটি এমন কিছু বেশি সময় নয়, কিন্তু তবুও অনেকেই স্কাউটশিপের কাছে তাকে বিদায় জানাতে এল। স্কাউটশিপের প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করে ইঞ্জিন চালু করার জন্যে যখন মূল প্রবেশপথ বন্ধ করতে যাচ্ছে তখন লিয়ারা উঁকি দিয়ে বলল, "নিশি।"

"কী হল লিয়ারা?"

"সাবধানে থেকো।"

নিশি চোখ মটকে বলল, "থাকব লিয়ারা।"

* * * * * *

বিধ্বস্ত মহাকাশযানের ডকিং বে'তে স্কাউটশিপটা নামিয়ে নিশি কিছুতেই প্রবেশপথ উন্মুক্ত করতে পারল না। মহাকাশযানের মূল সিস্টেমকে পাশ কাটিয়ে তাকে জরুরি কিছু পদক্ষেপ নিতে হল। প্রবেশপথের কিছু অংশ লেজার দিয়ে কেটে শেষ পর্যন্ত তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে হল, যার অর্থ ভিতরে কোনো জীবিত মানুষ নেই। নিশি গোলাকার প্রবেশপথ দিয়ে ভেসে ভেসে মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষের দিকে যেতে থাকে। রুহানের অনুমান সত্যি, মহাকাশযানটি তার অক্ষে ঘুরছে না, ভিতরে কৃত্রিম মহাকর্ষ নেই। নিশি ভেসে ভেসে করিডোর ধরে যেতে যেতে আবিষ্কার করে, ভিতরে তুলকালাম কিছু কাণ্ড ঘটে গেছে। মহাকাশযানের পুরোটি বিধ্বস্ত হয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় বিস্ফোরণের চিহ্ন, আগুনে পোড়া কালো যন্ত্রপাতি ইতস্তত ভাসছে। দেয়ালে ফাটল, বাতাসের চাপ অনিয়মিত। নিয়ন্ত্রণকক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে সে একাধিক মৃতদেহকে ভেসে বেড়াতে দেখল, সেগুলিতে ভয়ানক আঘাতের চিহ্ন, দেখে মনে হয়, এই মহাকাশযানে কোনো বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়েছে। নিশি সাবধানে তার পায়ের সাথে বাঁধা স্বয়ংক্রিয় এটমিক স্ক্রাইবারটি তুলে নিল, ভিতরে হঠাৎ করে কেউ আক্রমণ করতে চাইলে তাকে প্রতিহত করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে বের হয়ে নিশি বড় করিডোরটি ধরে ভাসতে ভাসতে মহাকাশযানের দলপতির ঘরটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। ঘরটির দরজা বন্ধ ছিল, হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই খুলে গেল। ভিতরে আবছা অন্ধকার, তার মাঝে নিশির মনে হল দেয়ালের কাছে কোনো একজন মানুষ ঝুলে আছে। নিশি পায়ে ধাক্কা দিয়ে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল একজন মানুষ নিজেকে দেয়ালের সাথে বেঁধে ঝুলে রয়েছে, মানুষটি এখনো জীবিত। নিশি চমকে উঠে বলল, "কে? কে ওখানে?"

মানুষটি জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার এই মহাকাশযানে তোমাকে শুভ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

নিশি দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? এখানে কী হয়েছে?"

"আমার নাম জুক। ক্যাপ্টেন জুক। আমি এই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন। এখানে একটা বিদ্রোহ হয়েছে। সেনা বিদ্রোহ।"

"সেনা বিদ্রোহ?"

"হ্যাঁ। বিদ্রোহটা দমন করা হয়েছে, কিন্তু শেষরক্ষা করা যায় নি। বিদ্রোহী মহাকাশচারীরা মারা গেছে। আমি এখনো বেঁচে আছি, কিন্তু অচিরেই মারা যাব।"

"কেন?"

"ক্ষতগুলি দূষিত হয়ে গেছে। সারা শরীরে পচন শুরু হয়েছে।"

তোমাকে আমি স্কাউটশিপে করে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মহাকাশযানে তোমাকে চিকিৎসা করব। প্রয়োজন হলে শীতলঘরে করে তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাব।"

ক্যাপ্টেন জুক বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করে বলল, "তার সুযোগ হবে না। আমার সময় শেষ হয়ে আসছে।"

নিশি আরো একটু এগিয়ে গেল, ক্যাপ্টেন জুকের সময় সত্যি শেষ হয়ে আসছে। কৃত্রিম জীবনধারণ একাধিক জ্যাকেট তাকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাথার ভিতর থেকে কিছু তার বের হয়ে এসেছে, শরীরের নানা জায়গায় নানা ধরনের যন্ত্র এবং নানা আকারের টিউব বিভিন্ন ধরনের তরল পাঠাচ্ছে এবং বের করে আনছে। ক্যাপ্টেন জুক তার শীর্ণ দুই হাতে কিছু একটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। ভিতরে আবছা অন্ধকার, জিনিসটি কী ভালো করে দেখতে গিয়ে নিশি চমকে উঠল, এটি একটি স্টান্টগান।

নিশি নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এটমিক স্ক্রাইবারটা তুলে নেয়ার আগেই ক্যাপ্টেন জুক স্টান্টগান দিয়ে তাকে গুলি করল। পাঁজরে তীক্ষ্ণ একটি ব্যথা অনুভব করল নিশি, স্টান্টগানের ক্যাপসুল থেকে জৈব রসায়ন ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে, নিশি হঠাৎ করে সমস্ত শরীরে এক ধরনের খিঁচুনি অনুভব করে। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে সে দেখতে পেল ক্যাপ্টেন জুক হাত বাড়িয়ে তার ভাসমান দেহটিকে আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে বলছে—"এস বন্ধু! আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।"

নিশির জ্ঞান হল লিয়ারার গলার স্বরে, পিঠে ঝুলিয়ে রাখা যোগাযোগ মডিউল থেকে তাকে সে ডাকছে। জ্ঞান হওয়ার পরেও নিশি ঠিক বুঝতে পারল না সে কোথায়, মনে হল সে একটি ঘোরের মাঝে আছে, ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত মানুষের মতো তার চিন্তা বারবার জট পাকিয়ে যেতে থাকে। কষ্ট করে সে চোখ খুলে তাকাল, তার আশপাশে অনেক কিছু ভাসছে, ঘরে একটা কটু গন্ধ, নিশির মনে হয় সে বুঝি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। অনেক কষ্ট করে নিজেকে সে জাগিয়ে রেখে মাথা ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ মাথায় তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা অনুভব করে, চোখের সামনে লাল একটা পরদা ভেসে আসে, মাথার ভিতরে কিছু একটা দপদপ করতে থাকে। নিশি মাথায় স্পর্শ করতেই চমকে উঠল, তার মাথার মাঝে জমাট বাঁধা রক্ত, সেখান থেকে সরু একটা নমনীয় টিউব বের হয়ে আসছে। নিশি চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তাল সামলাতে না পেরে সে মহাকর্ষহীন পরিবেশে বারকয়েক ঘুরে যায়, দেয়াল ধরে কোনোমতে সামলে নিল নিশি। মাথা ঘুরিয়ে দেয়ালের পাশে বেঁধে রাখা ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল মানুষটি মৃত। তার মাথায় একটি হেলমেট পরানো, সেখান থেকে কিছু তার দেয়ালে লাগানো একটি যন্ত্রে গিয়েছে, যন্ত্রটি অপরিচিত, সে আগে কখনো দেখে নি। নিশি কাছে গিয়ে দেখল সেটি এখনো গুঞ্জন করে যাচ্ছে।

নিশি হঠাৎ আবার মাথায় তীব্র এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে, মাথার ভিতরে কিছু একটা দপদপ করতে থাকে, চোখের সামনে বিচিত্র সব রং খেলা করতে থাকে। যোগাযোগ মডিউলে আবার সে লিয়ারার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "কী হয়েছে নিশি?"

নিশি কাতর গলায় বলল, "বুঝতে পারছি না। আমার মাথায় একটা টিউব ঢোকানো হয়েছে, মনে হয় কোনো একটা তথ্য পাঠানো হচ্ছে।"

"কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। আমার মস্তিষ্কে কিছু একটা হচ্ছে। আমি বিচিত্র সব জিনিস দেখছি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না।"

"তুমি কোনো চিন্তা কোরো না নিশি, আমি রুহানের সাথে কথা বলে কিছু একটা ব্যবস্থা করছি।"

নিশি ক্লান্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ দেখ কিছু করতে পার কি না।"

নিশি চোখ বন্ধ করে আবার জ্ঞান হারাল, তার মনে হতে লাগল মস্তিষ্কের ভিতর অসংখ্য প্রাণী কিলবিল করছে।

মহাকাশযান থেকে তার মস্তিষ্কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে যখন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হল তখন সে বিড়বিড় করে কিছু একটা কথা বলছিল, মনে হল সে অদৃশ্য কোনো মানুষের সাথে কথা বলছে, কী বলছে ঠিক বোঝা গেল না, শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন জুক-এর নামটা কয়েকবার শোনা গেল।

* * * * * *

নিশির মস্তিষ্কে কয়েকটা ছোটখাটো অস্ত্রোপচার করে তাকে শেষ পর্যন্ত আবার সুস্থ করে তোলা হয়েছে। শারীরিক দিক দিয়ে তার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মানসিকভাবে তাকে সব সময়েই খানিকটা বিপর্যস্ত দেখায়। লিয়ারা একদিন জিজ্ঞেস করল, "নিশি, তোমার কী হয়েছে? তোমাকে সব সময় এত চিন্তিত দেখায় কেন?"

নিশি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি ব্যাপারটা ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু সব সময় মনে হয় আমি আসলে এক জন মানুষ নই, আমার ভিতরে আরো এক জন মানুষ আছে।"

"আরো এক জন মানুষ? কী বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার পুরো শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, বলা যেতে পারে তোমার মস্তিষ্কের একটা একটা নিউরন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে—"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেই নিউরনে কী তথ্য রয়েছে সেটা তো পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। আমার ধারণা—"

"তোমার ধারণা?"

"বিধ্বস্ত মহাকাশযানটাতে ক্যাপ্টেন জুক তার স্মৃতিটা জোর করে আমার মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

লিয়ারা শান্ত গলায় বলল, "তুমি সেটা আগেও বলেছ নিশি, কিন্তু তুমি তো জান সেটি ঠিকভাবে করার মতো যন্ত্র পৃথিবীতে নেই। একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি রাখার মতো কোনো মেমোরি মডিউল নেই।"

"ক্যাপ্টেন জুকের মহাকাশযানে একটা অপরিচিত যন্ত্র ছিল, হয়তো সেটাই মানুষের মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে স্মৃতি স্থানান্তর করে।"

"সেটি তোমার একটি অনুমান মাত্র।"

"কিন্তু আমার ধারণা আমার এই অনুমান সত্যি।"

লিয়ারা ভয় পাওয়া চোখে বলল, "তুমি কেন এই কথা বলছ?"

"আমি বুঝতে পারি।"

"বুঝতে পার?"

"হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হয় ক্যাপ্টেন জুক মস্তিষ্কের ভিতরে আমার সাথে কথা বলে।"

"কথা বলে?" লিয়ারা অবাক হয়ে বলল, "কী বলে?"

"সে বের হয়ে আসতে চায়।"

"কেমন করে বের হয়ে আসতে চায়?"

নিশি বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না।"

লিয়ারা শংকিত দৃষ্টিতে নিশির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিশির মস্তিষ্কে যে ক্যাপ্টেন জুক রয়েছে এবং সে যে বের হয়ে আসতে চায় সেই কথাটির প্রকৃত অর্থ কী সেটা তার পরদিনই প্রকাশ পেল। নিয়ন্ত্রণকক্ষে নিশি আর লিয়ারা মিলে মূল সিস্টেমের একটা ত্রুটি সারাতে সারাতে হালকা কথাবার্তা বলছিল। সূক্ষ্ম একটি তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসানোর জন্যে লিয়ারা নিশ্বাস বন্ধ করে রেখে কাজটি সেরে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষের ডিজাইনটি ঠিক নয়।"

নিশি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লিয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন ঠিক নয়?"

"এই যেমন মনে কর নিশ্বাস নেয়ার ব্যাপারটা। প্রায় প্রতি সেকেন্ডে আমাদের একবার নিশ্বাস নিতে হয়। কী ভয়ানক ব্যাপার!"

নিশি হেসে বলল, "তুমি নিশ্বাস নিতে চাও না?"

"আমি চাই কি না চাই সেটা কথা নয়, বেঁচে থাকতে হলে আমাকে নিশ্বাস নিতেই হবে, আমার সেখানেই আপত্তি।"

লিয়ারার কথার ভঙ্গিতে নিশি শব্দ করে হেসে ফেলল, বলল, "তোমার আর কিসে কিসে আপত্তি বল দেখি!"

লিয়ারা মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি আমার কথার সাথে একমত হবে না?"

নিশি কিছু একটা বলার জন্যে লিয়ারার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু না বলে বিচিত্র এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে তার মেরুদণ্ড সোজা করে শক্ত হয়ে বসল। লিয়ারা অবাক হয়ে দেখল নিশির চেহারা কেমন যেন পাল্টে গেছে, তার চোখেমুখে হাসিখুশির ভাবটি নেই, সেখানে কেমন যেন অপরিচিত কঠোর একটি ভাব চলে এসেছে। লিয়ারা শংকিত গলায় বলল, "নিশি, কী হয়েছে তোমার?"

নিশি খুব ধীরে ধীরে লিয়ারার দিকে তাকাল, তার দৃষ্টি কঠোর। সে কঠিন গলায় বলল, "আমি নিশি নই।"

"তুমি কে?"

"আমি জুক। ক্যাপ্টেন জুক।"

"জুক?"

"হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত আমি বের হয়েছি।" নিশি তার হাত চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, "আমার হাত।" শরীরে হাত বুলিয়ে বলল, "আমার শরীর!"

লিয়ারা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "নিশি! নিশি—তোমার কী হয়েছে নিশি?"

নিশি ক্রুদ্ধ চোখে লিয়ারার দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "আমি নিশি নই।"

লিয়ারা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল, সাথে সাথে নিশিও উঠে দাঁড়িয়ে খপ করে লিয়ারার হাত ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

লিয়ারা কাতর গলায় বলল, "নিশি! তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?"

"না।" নিশি বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে বলল, "কিন্তু চিনতে কতক্ষণ? এস। আমার কাছে এস।"

লিয়ারা প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে মুক্ত করে ছিটকে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। লিয়ারার কাছে খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই রুহান এবং অন্যেরা এসে আবিষ্কার করল নিশি দুই হাতে তার মাথা ধরে টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। রুহান নিশির কাছে গিয়ে ডাকল, "নিশি।"

নিশি সাথে সাথে মাথা তুলে তাকাল। বলল, "কী হল রুহান?"

"তোমার কী হয়েছিল?"

"আমার? আমার কী হবে?"

"তুমি নিজেকে ক্যাপ্টেন জুক বলে দাবি করছিলে কেন?"

মুহূর্তে নিশির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। রক্তশূন্য মুখে বলল, "করেছিলাম নাকি?"

লিয়ারা কাছে এসে নিশির হাত স্পর্শ করে বলল, "হ্যাঁ, নিশি করেছিলে।"

নিশি দুই হাতে নিজের চুল খামচে ধরে বলল, "আমি জানতাম! আমি জানতাম!"

"কী জানতে?"

"আমার মাঝে সেই শয়তানটা ঢুকে গেছে। এখন সে বের হতে শুরু করেছে! কী হবে এখন?"

রুহান নিশির কাঁধ ধরে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি শুধু শুধু ঘাবড়ে যাচ্ছ নিশি। মহাকাশযানের ডাটাবেসে অন্তত এক ডজন মনোবিজ্ঞানী আছে! এখানকার চিকিৎসকদের নিয়ে তারা কয়েকদিনে তোমার সমস্যা সারিয়ে তুলবে।"

নিশি অবশ্যি কয়েকদিনে সেরে উঠল না, দ্বিতীয়বার তার ভিতর থেকে ক্যাপ্টেন জুক বের হয়ে এল তিন দিন পর। নিশি ব্যাপারটা টের পেল পরদিন ভোরবেলা, নিজেকে হঠাৎ করে আবিষ্কার করল মহাকাশযানের ডকিং বে'তে। রাতের পোশাক পরে সে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে কেন এসেছে, কীভাবে এসেছে সে জানে না। নিশি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে ফিরে এসে আবিষ্কার করল তার পুরো ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। মনে হয় কেউ একজন ইচ্ছে করে সেটি তছনছ করে রেখেছে, মানুষটি কে হতে পারে বুঝতে তার দেরি হল না। মাথার কাছে ভিডি সেন্টারে কেউ একজন তার জন্যে একটা ভিডিও ক্লিপ রেখে গেছে।

ভিডি সেন্টার স্পর্শ করতেই ঘরের মাঝামাঝি তার নিজের চেহারা ফুটে উঠল—সে নিজেই তার জন্যে কোনো একটা তথ্য রেখে গেছে! নিশি অবাক হয়ে তার নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটি সে নিজে কিন্তু তবু সে জানে মানুষটি অন্য কেউ। নিশি অবাক হয়ে তার নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল, চোখের দৃষ্টি ক্রূর, মুখের ভঙ্গিতে একই সাথে বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং অবজ্ঞা। হাত তুলে এই মানুষটি হিংস্র গলায় বলল, "তুমি নিশ্চয়ই নিশি—আমি তোমাকে কয়টা কথা বলতে চাই।"

মানুষটি নিজের দেহকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে শরীরটা দেখছ এটা আমার শরীর। আমার। তুমি যদি ভেবে থাক তুমি জন্ম থেকে এই শরীরটাকে ব্যবহার করে এসেছ বলে এটি তোমার, তাহলে জেনে রাখ—এটা সত্যি নয়। এটা ভুল। এটা মিথ্যা। তুমি স্বীকার কর আর নাই কর আমি এই দেহের মাঝে প্রবেশ করেছি। আমি খুব খুঁতখুঁতে মানুষ, আমার ব্যক্তিগত জিনিস অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে ভালো লাগে না। তাই তুমি এই শরীর থেকে দূর হয়ে যাও।"

মানুষটি হঠাৎ ষড়যন্ত্রীদের মতো গলা নিচু করে বলল, "তুমি যদি নিজে থেকে এই শরীর ছেড়ে না যাও আমি তোমাকে এখান থেকে দূর করব। আমার নাম ক্যাপ্টেন জুক, আমার অসাধ্য কিছু নেই।"

ভিডি সেন্টারটি অন্ধকার হয়ে যাবার পরও নিশি হতচকিত হয়ে বসে রইল, পুরো ব্যাপারটি তার কাছে একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। নিশি তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের অবসাদ অনুভব করে। তার চোখ রক্তবর্ণ, শরীরের নানা জায়গায় চাপা যন্ত্রণা, ক্যাপ্টেন জুক নামের এই মানুষটি সারারাত তাকে নিদ্রাহীন রেখে শরীরের ওপর কী কী অত্যাচার করেছে কে জানে!

তৃতীয়বার ক্যাপ্টেন জুকের আবির্ভাব হল আরো তাড়াতাড়ি এবং সে নিশির শরীরে অবস্থান করল আরো দীর্ঘ সময়ের জন্যে। মহাকাশযানের সবাই তাকে এবার একটা বিচিত্র বিতৃষ্ণা নিয়ে লক্ষ করল। নিশি নামক যে মানুষটার সাথে মহাকাশযানের প্রায় সবার এক ধরনের আন্তরিক হৃদ্যতা রয়েছে তার মাঝে প্রায় দানবীয় একটা চরিত্রকে আবিষ্কার করে সবাই আতংকে শিউরে উঠল। নিশির দেহের মাঝে অবস্থান করা ক্যাপ্টেন জুক মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণকক্ষে গিয়ে মহাকাশযানের অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্রটি খোলার চেষ্টা করল। খবর পেয়ে রুহান তাকে থামাতে এল, বলল, "তুমি এটা করতে পারবে না নিশি।"

নিশির দেহে অবস্থান করা মানুষটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তুমি খুব ভালো করে জান আমি নিশি নই। আমি একটি মহাকাশযানের সর্বাধিনায়ক। আমি ক্যাপ্টেন জুক। আমার অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্র খোলার অধিকার আছে।"

রুহান বলল, "একজন মানুষের পরিচয় তার দেহ দিয়ে। তোমার দেহটি নিশির, কাজেই তার মস্তিষ্কে এই মুহূর্তে যে-ই থাকুক না কেন, মহাকাশযানের হিসেবে তুমি হচ্ছ নিশি। মহাকাশযানের ডাটাবেসে ক্যাপ্টেন জুক বলে কেউ নেই। আমি তাকে চিনি না।"

"না চিনলে এখন চিনে নাও। এই যে আমি—ক্যাপ্টেন জুক।"

"তুমি যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে না যাও আমি তোমাকে নিরাপত্তাকর্মী দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে নিয়ে যাব।"

ক্যাপ্টেন জুক হা হা করে হেসে বলল, "তোমার বিশ্বস্ত সহকর্মীকে তুমি গ্রেপ্তার করবে? মহাকাশযানের আইন কি তোমাকে সেই অধিকার দিয়েছে?"

রুহান তীব্র দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

নিশি দুই দিন পর নিজেকে আবিষ্কার করল মহাকাশযানের এক পরিত্যক্ত ঘরে। তার সারা শরীর দুর্বল এবং অবসাদগ্রস্ত। চোখ লাল, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, নিশির মনে হয় মাথার ভিতরে কিছু একটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। সে কোনোভাবে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে যেতে থাকে। বড় করিডোরে তার লিয়ারার সাথে দেখা হল, সে অবাক হয়ে বলল, "তুমি কে? নিশি নাকি ক্যাপ্টেন জুক?"

"নিশি।"

লিয়ারা এসে তার হাত ধরে কোমল গলায় বলল, "তোমার এ কী চেহারা হয়েছে নিশি?"

নিশি দুর্বলভাবে বলল, "জানি না লিয়ারা। ক্যাপ্টেন জুক আমাকে শেষ করে দিচ্ছে।"

"কী চায় সে?"

"আমার শরীরটা। আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে আমার শরীরটাকে ব্যবহার করবে।"

লিয়ারা ভয়ার্ত চোখে নিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে আমরা কীভাবে সাহায্য করব?"

"জানি না।" নিশি মাথা নেড়ে বলল, "মনে হয় আমাকে সাহায্য করার সময় পার হয়ে গেছে লিয়ারা। আমাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না।"

লিয়ারা নরম গলায় বলল, "এরকম কথা বোলো না নিশি। নিশ্চয়ই আমরা কিছু একটা ভেবে বের করব। চল, আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"ধন্যবাদ লিয়ারা।"

নিজের ঘরে নিশির জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তার টেবিলের উপর একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং ভিডি সেন্টারে আরো একটা ভিডিও ক্লিপ। সেখানে কী থাকতে পারে নিশির অনুমান করতে কোনো সমস্যা হল না। ভিডি সেন্টারটি চালু করতে তার ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু না করে কোনো উপায় ছিল না।

এবারের ভিডিও ক্লিপটি ছিল আগেরবারের থেকেও উদ্ধত। মানুষটি তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলল, "আহাম্মক! এখনো আমার কথা বিশ্বাস করলে না? আমি এই শরীরটাকে নিজের জন্যে চাই। পুরোপুরি চাই।"

ক্যাপ্টেন জুক দীর্ঘ একটা নিশ্বাস নিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "নির্বোধ কোথাকার। তুমি দেখেছ আমি বারবার ফিরে আসছি? প্রত্যেকবার আসছি আগেরবার থেকে তাড়াতাড়ি, কিন্তু থাকছি বেশি সময়ের জন্যে। এর পরেরবার আমি আসব আরো আগে, থাকব আরো বেশি সময়। এমনি করে আস্তে আস্তে এমন একটা সময় আসবে যখন আমি থাকব পুরো সময় আর তুমি একেবারেই থাকবে না। শরীরটা হবে আমার। পুরোপুরি আমার।"

নিশি অবাক হয়ে দেখল তার শরীরের মাঝে মানুষটা হা হা করে হাসতে শুরু করেছে। হাসতে হাসতে সে অস্ত্রটা দেখিয়ে বলল, "দেখেছ আমি একটা অস্ত্র যোগাড় করেছি? কী করব এই অস্ত্র দিয়ে শুনতে চাও? আমার মহাকাশযানে কী ঘটেছিল মনে আছে—এখানেও তাই হবে। তবে এখানে কোনো ভুল হবে না। তুমি কী ভাবছ নিশি? এই অস্ত্র তুমি ফিরিয়ে দেবে? তোমাকে বলি আমি শুনে রাখ, আমার কাছে আরো অস্ত্র আছে, আমি লুকিয়ে রেখেছি এই মহাকাশযানে। যখন সময় হবে বের করে আনব!"

নিশি কোনোভাবে টেবিলটা ধরে হতবাক হয়ে ভিডি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরবর্তী দুদিন নিশির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে রইল। মহাকাশযানের চিকিৎসা কেন্দ্রে তার শরীরের মাঝে কিছু বিচিত্র ধরনের বিষাক্ত জিনিস আবিষ্কার করা হল। তার নিদ্রাহীন বিশ্রামহীন দেহ পরিপূর্ণভাবে ভেঙে পড়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। নিশিকে চিকিৎসা কেন্দ্রে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হল দুই দিন। বিশ্রাম নিয়ে শরীরটি যখন মোটামুটিভাবে সুস্থ হয়ে এল তখন ক্যাপ্টেন জুক ফিরে এল আবার, এবারে আগের চাইতেও তীব্রভাবে, আগের চাইতেও নৃশংসভাবে।

ক্যাপ্টেন জুক এবারে নিশির দেহ নিয়ে ফিরে গেল অস্ত্রাগারে। নিজেকে অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে নিশি লিয়ারাকে জিম্মি করে নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিল খুব সহজে। সে নির্বিচারে অস্ত্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত, কিন্তু কেউ তাকে স্পর্শ করবে না সেটি সে খুব ভালো করে জানে। নিয়ন্ত্রণকক্ষের সবরকম প্রবেশপথ বন্ধ করে সে মহাকাশযানের গতিপথ পাল্টানোর চেষ্টা করল, কাছাকাছি মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথে সংঘর্ষ ঘটানোর জন্যে ডাটাবেসে বিচিত্র সব তথ্য প্রবেশ করতে শুরু করল।

নিশি অবশ্য তার কিছুই জানল না। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, সে নিজেকে আবিষ্কার করল নিয়ন্ত্রণকক্ষের পদিআঁটা নরম চেয়ারে। তার সামনেই আরেকটা চেয়ারে লিয়ারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নিশি অবাক হয়ে বলল, "তোমার কী হয়েছে লিয়ারা?"

লিয়ারা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, "তোমার সেটা জেনে কোনো লাভ নেই নিশি। তুমি বরং এসে আমাকে খুলে দাও।"

নিশি উঠে দাঁড়াতেই তার মাথা হঠাৎ ঘুরে উঠল, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে টলতে টলতে সে লিয়ারার কাছে এগিয়ে যায়। তার সারা শরীরে এক বিচিত্র অসুস্থ অনুভূতি,

মনে হয় এক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। নিশি বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, "কী হয়েছিল এখানে লিয়ারা?"

"ভিডি স্ক্রিনে তোমার জন্যে কিছু তথ্য রেখে গেছে ক্যাপ্টেন জুক।"

নিশি টলতে টলতে ভিডি স্ক্রিনটা স্পর্শ করতেই সেখানে নিজেকে দেখতে পেল ভয়ংকর খ্যাপা একটা মানুষ হিসেবে। তীব্র স্বরে হিসহিস করে বলল, "আবার আমি ফিরে গেলাম নির্বোধ আহাম্মক। তবে জেনে রাখ, এর পরেরবার যখন ফিরে আসব আমি আর ফিরে যাব না। তোমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে নিশি। জীবনের শেষ কয়টা দিন যদি পার উপভোগ করে নাও। তবে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি সেটি খুব সহজ হবে না। আমি তোমার শিরায় শিরায় নিহিলা বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছি—তুমি মারা যাবে না, কিন্তু প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তোমার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠবে, মনে হবে তোমার ধমনী দিয়ে গলিত সীসা বয়ে যাচ্ছে। মহাকাশযানের সব চিকিৎসক মিলে যখন তোমাকে সুস্থ করে তুলবে তখন আমি ফিরে আসব সেই সুস্থ দেহে।"

নিশি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল মানুষটা হা হা করে হাসতে শুরু করেছে খ্যাপার মতো। সে হঠাৎ নিজে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছিল, লিয়ারা জাপটে ধরে তাকে দাঁড়া করিয়ে রাখল। কাতর গলায় ডাকল, "নিশি, নিশি।"

"বল লিয়ারা।"

"কী হবে এখন নিশি।"

নিশি দুর্বলভাবে হেসে বলল, "আমি ক্যাপ্টেন জুককে হত্যা করব লিয়ারা।"

"হত্যা করবে? ক্যাপ্টেন জুককে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি আর ক্যাপ্টেন জুক তো একই মানুষ।"

"তাতে কিছু আসে যায় না লিয়ারা। তবু আমি তাকে হত্যা করব। এন্ড্রোমিডার কসম।"

* * * * * *

চোখ খুলে তাকাল ক্যাপ্টেন জুক, আবার ফিরে এসেছে সে নিশির শরীরে। এবারে আর কেউ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, এখন থেকে নিশির শরীরটি পুরোপুরি তার। কীভাবে অন্যের দেহে অনুপ্রবেশ করে তাকে দখল করতে হয় সেটা সে খুব ভালো করে জানে। কতবার করেছে সে! এক দেহ থেকে অন্য দেহে, সেখান থেকে আবার অন্য দেহে। জরাজীর্ণ দুর্বল বৃদ্ধের দেহ থেকে সুস্থ-সবল কোনো যুবকের দেহে। ক্যাপ্টেন জুক উঠতে গিয়ে হঠাৎ করে আবিষ্কার করল তার হাতপা বিছানার সাথে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা। চমকে উঠে হ্যাঁচকা টান দিতেই টেবিলের হলোগ্রাফিক ভিডি স্ক্রিন চালু হয়ে উঠল। নিশির একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক অবয়ব দেখতে পেল ক্যাপ্টেন জুক। শুনতে পেল নিশি মাথা ঝুঁকিয়ে বলছে, "শুভ সকাল ক্যাপ্টেন জুক। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি নিশি। আমার জন্যে অনেকবার তুমি ভিডি স্ক্রিনে তথ্য রেখেছ এবারে আমি রাখছি। একটা দেহ যখন দুজন মানুষ ব্যবহার করে তখন কথা বলার আর অন্য উপায় কী?

"ক্যাপ্টেন জুক, তুমি সম্ভবত তোমার হাতপায়ের বাঁধনকে টানাটানি করেছ, ভিতরে মাইক্রোসুইচ ছিল, সেটা এই ভিডি স্ক্রিনকে চালু করেছে। আমি সেভাবেই এটা প্রস্তুত করেছি। তুমি জেগে ওঠার পর আমি তোমার সাথে কথা বলব। হাতকড়াগুলি টেনে খুব লাভ হবে না। স্টেনলেস স্টিলে শতকরা পাঁচ ভাগ জিরকনাইট দিয়ে এটাকে বাড়াবাড়ি শক্ত

করা হয়েছে। মানুষ যদি টাইরানোসোরাস রেক্সকে বেঁধে-রাখতে চাইত সম্ভবত এই ধরনের কিছু ব্যবহার করত! কাজেই টানাটানি করে তুমি এটা খুলতে পারবে না। শুধু শুধু চেষ্টা করে লাভ নেই, আমি চাই তুমি আমার কথা মন দিয়ে শোন।

"ক্যাপ্টেন জুক, আমি তোমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি আমার তৈরি করা যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক কাজ করে থাকে তাহলে এই মুহূর্তে উপরের দেয়াল থেকে একটা বিশাল পেন্ডুলাম দুলতে শুরু করবে। দোলনকালটা আমি হিসেব করেছি, এটা হবে পাঁচ সেকেন্ড, তার বেশিও না, কমও না।"

নিশি কথা বলা বন্ধ করল এবং সাথে সাথে ক্যাপ্টেন জুক আবিষ্কার করল সত্যি সত্যি তার গলার উপর দিয়ে বিশাল একটা পেন্ডুলাম বাম দিক থেকে ডান দিকে ঝুলে গেল। ডান দিকে শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার সেটা দুলে এল বাম দিকে। তারপর আবার ডান দিকে।

নিশি ভিডি স্ক্রিনে আবার কথা বলতে শুরু করে, "দোলনকালটা অনেক চিন্তাভাবনা করে পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়া করিয়েছি। আমার ধারণা, মানুষের স্নায়ুতে চাপ ফেলার জন্যে পাঁচ সেকেন্ড যথাযথ সময়। কী হচ্ছে সেটা বোঝার জন্যে যথেষ্ট আবার অপেক্ষা করার জন্যে খুব বেশি দীর্ঘ নয়। একটা পেন্ডুলাম তোমার গলার উপর দিয়ে দুলে যাবে সেটি কেন তোমার স্নায়ুতে চাপ ফেলবে তুমি নিশ্চয়ই সেটা ভেবে অবাক হচ্ছ। অবাক হবার কিছু নেই, তুমি পেন্ডুলামটির নিচে ভালো করে তাকাও। একটা ধারালো ব্লেড দেখেছ ক্যাপ্টেন জুক? স্টেনলেস স্টিলের পাতলা একটা ব্লেড। শক্ত কিছু কাটতে পারবে না—কিন্তু মানুষের টিস্যু, চামড়া, ধমনী কেটে ফেলবে সহজেই। আমি তার চাইতে শক্ত কিছু কাটতেও চাই না।

"ক্যাপ্টেন জুক। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ একটা পেন্ডুলাম যদি তোমার গলার উপর দিয়ে প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একবার করে দুলে আসে—হোক না সেটা যতই ধারালো—তাতে ভয় পাবার কী আছে? আমি তোমার সাথে একমত—এতে ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু—"

নিশি থেমে গিয়ে সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "এই পেন্ডুলামটির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তুমি যদি খুব ভালো করে এর যান্ত্রিক কৌশলটি লক্ষ্য করে দেখে থাক তাহলে নিশ্চয়ই বুঝে গেছ পেন্ডুলামটি খুব ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে। কেন এটা করেছি নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ। আমি তোমাকে খুব ধীরে ধীরে হত্যা করতে চাই। এই ধারালো পেন্ডুলামটি তোমার গলাকে দু ভাগ করতে অনেকক্ষণ সময় নেবে—এই সারাক্ষণ সময় তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। মানুষের ওপর অত্যাচার করার এর চাইতে ভালো কিছু আমি খুঁজে পেলাম না। তবে এই আইডিয়াটা আমার নিজের নয়। এডগার এলেন পো নামে একজন অত্যন্ত প্রাচীন লেখক ছিলেন, এটি তার গল্পের আইডিয়া। কী মনে হয় ক্যাপ্টেন জুক? আইডিয়াটি চমৎকার না?

"ক্যাপ্টেন জুক। আমি এখন তোমার সম্পর্কে জানি। খানিকটা খোঁজখবর নিয়েছি, খানিকটা চিন্তাভাবনা করেছি। তুমি কী যন্ত্র দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে যাও সেটাও খানিকটা বুঝতে পেরেছি। মস্তিষ্কের যে অংশ মানুষের মূল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে সেই অংশে তুমি অনুপ্রবেশ কর। নিউরন ম্যাপিং দিয়ে সেটা হয়। চমৎকার বুদ্ধি। একজন মানুষের একাধিক চরিত্র থাকতে পারে, কাজেই কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। একবার মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করার পর তুমি কীভাবে তার দেহ দখল কর সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার পদ্ধতিটি খুব সহজ। যতক্ষণ দেহটা তোমার দখলে থাকে তুমি তার যত্ন নাও। যখন তোমার দেহটা ছেড়ে যাবার সময় হয় তুমি দেহের মাঝে একটা যন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যাও যেন

তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী এই দেহ নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে। এক বার, দুই বার, বার বার এটা তুমি কর। মস্তিষ্ক তখন আর যন্ত্রণার মাঝে দিয়ে যেতে চায় না, সেটি তোমার কাছে থাকে। তুমি নিয়ন্ত্রণ কর। একটা মানুষকে তুমি চিরদিনের জন্যে শেষ করে দাও।"

নিশি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আজ আমি এর সবকিছুর নিষ্পত্তি করব। চিরদিনের মতো। সেজন্যে আমার খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, খানিকটা নয় অনেকটাই! আমি তোমাকে হত্যা করব, কিন্তু তোমাকে তো আলাদা করে হত্যা করা যাবে না, হত্যা করতে হবে তোমার শরীরকে। সেটা তো আমারও শরীর—সেটাকে হত্যা করলে আমিও তো থাকব না। তবু আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। নিজে যদি না নিতাম তাহলে রুহানকে এই সিদ্ধান্তটা নিতে হত, গভীর একটা অপরাধবোধ তখন কাজ করত রুহানের মাঝে। এভাবেই ভালো।"

ভিডি স্ক্রিনে নিশি চুপ করে গিয়ে স্থির চোখে ক্যাপ্টেন জুকের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন জুক আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে ঝুলন্ত পেন্ডুলামের দিকে, খুব ধীরে ধীরে সেটা ঝুলছে বাম থেকে ডানে, ডান থেকে বামে, প্রতিবার দোলনের সময় সেটা একটু করে নিচে নেমে আসছে। ধারালো তীক্ষ্ণ পেন্ডুলামটা ঝুলছে ঠিক তার গলার উপরে। তার দুই হাতপা শক্ত করে বাঁধা হাতকড়া দিয়ে, এতটুকু নড়ার উপায় নেই, কিছুক্ষণের মাঝেই দুলতে দুলতে নেমে আসবে পেন্ডুলামের ধারালো ব্লেড। প্রথমে আলতোভাবে স্পর্শ করবে তার গলার চামড়াকে, তারপর সূক্ষ্ম একটা ক্ষতচিহ্ন হবে সেখানে। সেটি গভীর থেকে গভীরতর হবে খুব ধীরে ধীরে। প্রথমে কণ্ঠনালী, তারপর মূল ধমনীগুলি কেটে ফেলবে এই ভয়ংকর পেন্ডুলাম। প্রচণ্ড আতঙ্কে ক্যাপ্টেন জুক চিৎকার করে উঠল হঠাৎ।

সাথে সাথে নিশি নড়েচড়ে উঠল হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে, মৃদু হেসে বলল, "আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে তুমি একটা চিৎকার করেছ ক্যাপ্টেন জুক। মনে হয় আর্তচিৎকারে খুব ভয় পেয়ে সেই চিৎকার করেছ। আমি ছোট একটা সিস্টেম দাঁড়া করিয়েছি, কোনো চিৎকার শুনলে সেটা এই অংশটুকু চালু করে দেয়।

"ক্যাপ্টেন জুক। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আমার এই ঘরটাকে কিন্তু পুরোপুরি শব্দনিরোধক করা হয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পার। বাইরের কোনো শব্দ তুমি শুনবে না, এখানকার কোনো শব্দও বাইরে যাবে না। চিৎকার করে করে তোমার ভোকাল কর্ডকে ছিঁড়ে ফেললেও কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে না ক্যাপ্টেন জুক। আমার কী মনে হয় জান? তোমার চিৎকার শুনতে পেলেও কেউ আসত না!

"ক্যাপ্টেন জুক! আমি যদি হিসেবে ভুল করে না থাকি তাহলে আর কয়েক সেকেন্ডের মাঝে ধারালো পেন্ডুলামটি তোমার গলার মাঝে প্রথম পোঁচটি দেবে, খুব সূক্ষ্ম একটা পোঁচ। প্রথম প্রথম হয়তো তুমি শুধু তার স্পর্শটাই অনুভব করবে। কিছুক্ষণের মাঝেই সেটা গভীর হতে শুরু করবে। আমার কী মনে হয় জান? তুমি ছটফট না করে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাক ক্যাপ্টেন জুক। যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ হবে ততই মঙ্গল। মৃত্যুটা তোমারই হোক—আমি এই ভয়ংকর মৃত্যুর মাঝে জেগে উঠতে চাই না।

"বিদায় ক্যাপ্টেন জুক। তুমি কত দিন থেকে কত জন মানুষের মাঝে বেঁচে আছ আমি জানি না। আমার ভাবতে ভালো লাগছে এটা শেষ হল। ক্যাপ্টেন জুক বলে আর কেউ কখনো থাকবে না।"

হলোগ্রাফিক ভিডি স্ক্রিনটি অন্ধকার হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন জুক অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল ভয়ংকর পেন্ডুলামটির দিকে, সেটি দুলতে দুলতে নেমে আসছে নিচে। গলার চামড়ার

প্রথম স্তরটি কেটে ফেলেছে—আস্তে আস্তে আরো গভীর হতে শুরু করেছে। প্রথমে কাটবে কণ্ঠনালী, তারপর মূল ধমনী দুটি। ভয়ংকর আতংকে আবার চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন জুক, অমানুষিক আতংকের এক ভয়াবহ চিৎকার। বদ্ধঘরে সেই বিকট আর্তনাদ পাক খেতে থাকে, মনে হয় ছোট এই ঘরটিতে বুঝি নরক নেমে এসেছে।

হঠাৎ জেগে উঠল নিশি। রক্তে ভিজে গেছে সে, তার গলার উপর চেপে বসেছে ধারালো পেন্ডুলাম—দুলছে সেটি বাম থেকে ডানে ডান থেকে বামে। ডান হাতের কাছে সূক্ষ্ম একটা গোপন মাইক্রোসুইচ রয়েছে, সাবধানে সে স্পর্শ করল সেটি, পরপর দুবার। সাথে সাথে ঘরঘর শব্দ করে পেন্ডুলামটি উপরে উঠতে শুরু করল, ঘরের বামপাশে চারটি দরজা খুলে গেল শব্দ করে। অপেক্ষমাণ ডাক্তার, সহকারী রবোট, তাদের যন্ত্রপাতি, জরুরি জীবন ধারণ যন্ত্র, কৃত্রিম রক্ত, শ্বাসযন্ত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ছুটে এল ভিতরে। নিশ্বাস বন্ধ করে দরজার বাইরে তারা অপেক্ষা করছিল গোপন মাইক্রোসুইচে পরিচিত সংকেতের জন্যে। এক মুহূর্তে ঘরটি একটি অত্যাধুনিক জীবনরক্ষাকারী জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্রে পালটে যায়, নিশির উপরে ঝুঁকে পড়ে সবাই, কী করতে হবে সবাই জানে, অসংখ্যবার তারা মহড়া দিয়েছে গত দুই দিন।

লিয়ারা ভীত পায়ে ঢুকল ঘরটিতে। একজন ডাক্তার সরে গিয়ে জায়গা করে দিল তাকে। লিয়ারা নিশির হাত স্পর্শ করে তার উপর ঝুঁকে পড়ল। নিশি ফিসফিস করে বলল, "আমি করেছি লিয়ারা। হত্যা করেছি ক্যাপ্টেন জুককে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"আর আসবে না সে?"

"না, লিয়ারা। আর আসবে না। আমি জানি।"

সিস্টেম এডিফাস

এটাকেই নিশ্চয়ই বলে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা।

দুপুরবেলা আমাদের খানিকক্ষণের জন্যে কাজের বিরতি দেয়া হয়। আমি তখন আমার আকাশের কাছাকাছি অফিস থেকে নিচে নেমে আসি। ঠিক কী কারণ জানি না, মাটির কাছাকাছি এলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। পথের ধারের রবোস্ট্যান্ড থেকে প্রোটিন এবং স্টার্চের একটা জুতসই মিশ্রণের ক্যাপসুল কিনে এনে আমি সাজিয়ে রাখা ভ্রাম্যমাণ বেঞ্চগুলিতে বসে পড়ি। বেঞ্চগুলি তার প্রোগ্রাম করা পথে ঘুরে বেড়ায়, আমি চুপচাপ বসে থেকে পথেঘাটে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করা মানুষগুলিকে দেখি। আমার নিজেকে তখন অন্য জগতের মানুষ বলে মনে হয়, আমি কল্পনা করি আমার সামনে যেন একটি আন্তঃমহাজাগতিক জানালা খুলে গেছে এবং আমি অন্য কোনো একটি গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীর বিচিত্র কিছু প্রাণীকে দেখছি। বসে বসে আমার তখন মানুষের মনের ভাব অনুমান করতে খুব ভালো লাগে।

আজকেও আমি তাই করছিলাম, বেঞ্চে বসে প্রোটিন এবং স্টার্চের ক্যাপসুলটা চুষতে চুষতে মানুষগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের ভাব অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম। বয়স্ক একজন মানুষকে দেখে মনে হল কোনো কিছু নিয়ে তার ভিতরে খুব যন্ত্রণা—কে জানে হয়তো তার সর্বশেষ স্ত্রী ধনবান কোনো এক তরুণের সাথে পালিয়ে গেছে। হাস্যোজ্জ্বল একজন তরুণীকে দেখে মনে হল হয়তো তার ভালবাসার মানুষটি আজকে তাকে ভালবাসা নিবেদন করেছে। কমবয়সী নিরাসক্ত ধরনের একজন তরুণকে দেখে মনে হল সে হয়তো নতুন কোনো একটি মাদকের সন্ধান পেয়েছে। পিছু থেকে ধীরপায়ে হেঁটে আসা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ দেখে মনে হল তার ভিতরে এক ধরনের শান্ত সমাহিত ভাব চলে এসেছে—পৃথিবীর তুচ্ছ কোনো ব্যাপারে তার আর কোনো আকর্ষণ নেই। তার নির্লিপ্ত চেহারার মাঝে এক ধরনের ঐশ্বরিক পবিত্রতার ছাপ। মানুষটির কাছেই একজন প্রৌঢ়া রমণী, তার পোশাক এবং চেহারায় বিচিত্র এক ধরনের কৃত্রিমতা দেখে মনে হয় কোনো এক ধরনের কুটিল চিন্তায় মগ্ন।

ঠিক এই সময় আমি রনোপানের তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেলাম। টিপটিপ করে নিচু কয়েকটা শব্দ হল এবং আমি মানুষের আর্তনাদ শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম, একটু আগে দেখা মধ্যবয়সী শান্ত সমাহিত মানুষটি তার মুখের সমস্ত পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে দুই হাতে দুটি ভয়ংকরদর্শন রনোপান নিয়ে নির্বিচারে গুলি করে যাচ্ছে। আমার সামনেই আরেকজন চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

আমি হতবাক হয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ঠিক তখন আরো কয়েকজনকে ছোটাছুটি করতে দেখলাম, আরো কিছু গোলাগুলি হল এবং হঠাৎ করে শান্ত সমাহিত চেহারার মানুষটি তার মুখের পবিত্র ভাব নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে আমার দিকে ছুটে এল, তার আগেই কেউ একজন তাকে গুলি করল এবং আমি কিছু বোঝার আগেই মানুষটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আমার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আমি নিয়মিত ছায়াছবি দেখি এবং রগরগে ত্রিমাত্রিক রহস্য ছায়াছবিতে বহুবার গুলিবিদ্ধ চরিত্র আমাদের মতো দর্শকদের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, কিন্তু প্রকৃত এই ঘটনাটি ছায়াছবি থেকে একেবারেই ভিন্ন। গুলিবিদ্ধ মানুষটি ভয়ংকরভাবে ছটফট করতে লাগল এবং শরীরের বিভিন্ন ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। তার হাত থেকে রনোপানটি নিচে পড়িয়ে পড়ল এবং আমি কিছু না বুঝে সেটি হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করে নির্বোধের মতো চিৎকার করতে থাকলাম।

ঘটনার আকস্মিকতাটুকু কেটে যাবার পর আমি আবিষ্কার করলাম নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেরা আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে চাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কাটখোট্টা মহিলাটি তার মুখে যেটুকু কমনীয়তা আনা সম্ভব সেটুকু এনে মিষ্টি করে বলল যে ব্যাপারটি তাদের সদরদপ্তরে নিষ্পত্তি করা হবে। ব্যাপারটি যে আসলেই একটি ভুল বোঝাবুঝি এবং সদরদপ্তরের কর্মকর্তাদের সেটা বুঝিয়ে দেয়ার পরই যে আমাকে তারা ছেড়ে দেবে সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাউকে কোনো অপরাধের জন্যে গ্রেপ্তার করার পর নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করে সেটা সম্পর্কে আমার খানিকটা কৌতূহল ছিল। সদরদপ্তরে এসে আবিষ্কার করলাম যে তাদের কোনো ধরনের ব্যবহারই করা হয় না। আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আসবাবপত্রহীন একটি নিরানন্দ ঘরে আটকে রাখা হল। অনেক কষ্টে আমি একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "আমি এই ঘটনার সাথে

কোনোভাবেই জড়িত নই, আমাকে তোমরা কেন গ্রেপ্তার করে এনেছ?"

মানুষটি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবে আমি আশা করি নি; কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে সে তার তথ্যকেন্দ্রে উঁকি দিয়ে বলল, "তোমার হাতে মানুষের বেআইনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসায়ী মারা গেছে, তার অস্ত্র পাওয়া গেছে তোমার হাতে, কাজেই তুমি কোনোভাবে ব্যাপারটার সাথে জড়িত নও সেটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিরাপত্তাবাহিনীর লোকটির দিকে তাকালাম, শান্ত সমাহিত এবং পবিত্র চেহারার মানুষটি আসলে একজন বেআইনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসায়ী, দুর্ধর্ষ খুনে আসামি সেটি এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কাতর গলায় বললাম, "তুমি বিশ্বাস কর, আমি কিছুই জানি না।"

মানুষটি উদাস গলায় বলল, "হতে পারে। কিন্তু তুমি ঘটনার সময়ে হাজির ছিলে। অপরাধীর দেহে তোমার শরীরের ছাপ আছে। তুমি একটা ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিলে, আমাদের কিছু করার নেই।"

আমি একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই প্রথমবার ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা কথাটির প্রকৃত অর্থ অনুভব করতে শুরু করলাম।

* * * * * *

আসবাবপত্রহীন নিরানন্দ ঘরটিতে আমি দুই দিন কাটিয়ে দিলাম। সেখানে পায়ে দেয়ার জন্যে হালকা গোলাপি এক ধরনের পোশাক রাখা ছিল। খাবার বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল। শুধু তাই নয়, বিনোদনের জন্যে যাবতীয় উপকরণ সাজিয়ে রাখা ছিল, কিন্তু আমি তার কিছুই ব্যবহার করতে পারলাম না, পুরো সময়টুকু এক ধরনের অস্বস্তিকর চাপা আতংক নিয়ে অপেক্ষা করে করে কাটিয়ে দিলাম। তৃতীয় দিনে কয়েকজন মানুষ এসে আমাকে এই নিরানন্দ ঘরটি থেকে বের করে নিয়ে গেল। আমি ততক্ষণে পুরোপুরি ভেঙে পড়া একজন দুর্বল মানুষে পরিণত হয়ে গেছি।

কয়েকটি কক্ষ এবং কয়েকটি করিডোর পার করে আমাকে মাঝারি একটি হলঘরে উপস্থিত করা হল, সেখানে একটি বড় টেবিলকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু মানুষ বসে ছিল। আমাকে দেখে একজন সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "সে কী! তোমার এ কী চেহারা হয়েছে?"

আমি ভাঙা গলায় বললাম, "তুমি কি সত্যিই অবাক হয়েছ?"

"না। খুব অবাক হই নি। তোমার অবস্থায় হলে সম্ভবত আমিও এভাবে ভেঙে পড়তাম।"

আমি লোকটার কথায় কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম না। তার সামনে চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, "আমাকে তোমরা কেন গ্রেপ্তার করে এনেছ? কেন এখনো ধরে রেখেছ?"

"সে কথাটাই তোমাকে বলার জন্যে ডেকে এনেছি।"

আমি একটু আশা নিয়ে মানুষটার দিকে তাকালাম। কিন্তু তার মাছের মতো নিস্পৃহ চোখের দৃষ্টি দেখে হঠাৎ এক ধরনের আতংকে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। মানুষটি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই জান, একটি রাষ্ট্রের বিশাল শক্তি ব্যয় হয় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীদের ধরা এবং তাদের বিচার করার জন্যে।"

মানুষটি ঠিক কী বলতে চাইছে আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমি তবু যন্ত্রের মতো মাথা নাড়লাম। মানুষটি বলল, "রাষ্ট্র এই খাতে অর্থব্যয় কমানোর জন্যে নূতন একটি সিস্টেম দাঁড় করিয়েছে।"

"সিস্টেম?"

"হ্যাঁ। তার নাম দেয়া হয়েছে সিস্টেম এডিফাস।"

"এডিফাস?"

"হ্যাঁ। এই সিস্টেমের নিয়ম হল যখন কোনো অপরাধ ঘটবে তখন অপরাধের আশপাশে সবাইকে ধরে নিয়ে আসা হবে।"

"সবাইকে?"

"হ্যাঁ, কারণ এটাই সবচেয়ে সহজ। এটা করতে হলে কোনো অনুসন্ধান করতে হয় না, কোনো তদন্ত করতে হয় না, ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তাভাবনা-গবেষণা করতে হয় না। সবাইকে যখন ধরে আনা হয় তখন সিস্টেম এডিফাস তাদের সবাইকে জেরা করে। জেরা করে বের করে কে সত্যি বলছে কে মিথ্যা বলছে। সেখান থেকে অপরাধী খুঁজে বের করা হয়। শুধু তাই নয়, অপরাধের গুরুত্ব বের করা হয়।"

মানুষটি নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু অপেক্ষা করল, আমি কিছু না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"যখন অপরাধের গুরুত্ব বের করা হয় তখন তাকে শাস্তি দেয়া হয়। সিস্টেম এডিফাসের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তখন সে শাস্তি কার্যকর করতে পারে। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা থেকে শুরু করে মস্তিষ্ক শোধন, স্মৃতি পরিবর্তন, কারাদণ্ড যাকে যেটা দেয়া প্রয়োজন সেটা দিয়ে দিতে পারে। বিশাল তথ্যকেন্দ্র থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বলতে পার সিস্টেম এডিফাস দিয়ে একটি দেশের নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বিচার বিভাগকে অবলুপ্ত করে দেয়া হবে।"

আমি হতবাক হয়ে কোনোভাবে বললাম, "এই সিস্টেমটা ঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে? এটি নির্ভুলভাবে কাজ করে?"

"অবশ্যি কাজ করে।" মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "গত দশ বছর থেকে হাজারখানেক বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার এটার পিছনে কাজ করছে। বিশাল রিসার্চ করে এটা দাঁড় করানো হয়েছে। মৃত্যুকূপের সাথে যে ইন্টারফেস—"

"মৃত্যুকূপ?"

"হ্যাঁ।" মানুষটি সোজা হয়ে বলল, "যদি দেখা যায় কারো অপরাধের জন্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া দরকার সিস্টেম এডিফাস তখন মানুষটাকে মৃত্যুকূপে নিয়ে হত্যা করে।"

আমি আতংকিত হয়ে বললাম, "কীভাবে করে?"

"অনেক রকম উপায় রয়েছে। ইলেকট্রিক শক, হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস, বিষাক্ত ইনজেকশান, গুলিবর্ষণ, রক্তক্ষরণ, উচ্চচাপ কিংবা উচ্চতাপ—যার জন্যে যেটা প্রয়োজন। শুধু এই ইন্টারফেসটা তৈরি করতেই ছয় বছর সময় লেগেছে।"

আমি রক্তশূন্য মুখে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কবে থেকে এই সিস্টেম এডিফাস কাজ করছে?"

মানুষটি সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "মাত্র কিছুদিন হল শুরু করা হয়েছে। বলতে পার এটা এখনো পরীক্ষামূলক। প্রথম কয়েক বছর তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করে দেখা হবে—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "যেখানে মানুষের জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেটা একটা পরীক্ষামূলক সিস্টেম? আমাকে দিয়েও পরীক্ষা করা হবে?"

"হ্যাঁ। তোমার ব্যাপারটি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তুমি দাবি করছ যে তুমি

নিরপরাধ, অথচ আমাদের প্রাথমিক তথ্য বলছে তুমি অপরাধী। আমরা দেখতে চাই সিস্টেম এডিফাস কীভাবে এটার মীমাংসা করে।"

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "আমি একটা পরীক্ষার বিষয়বস্তু? আমি একটা গিনিপিগ? এক টুকরা তথ্য?"

"জিনিসটা এভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। তবে—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমি কোনো পরীক্ষার গিনিপিগ হতে চাই না।"

মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "তুমি না চাইলেই তো হবে না। এটা একটি দেশের সিদ্ধান্ত। একটা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত। একটা আইন—"

"আমি এই আইন মানি না।"

মানুষটি তার মাথা বাঁকা করে বলল, "শুধুমাত্র এই কথাটি বলার জন্যেই দেশদ্রোহিতা আইনে তোমার সাজা হতে পারে।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "হলে হোক। কিন্তু সেটা হতে হবে নিয়মের ভিতরে। আমি উজবুক কোনো সিস্টেমকে বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না।"

মানুষটি হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সুইচ টিপে বলল, "সাত নম্বর সেলে নিয়ে যাও।"

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে বিশাল আকারের দুজন মানুষ এসে আমাকে দুপাশ থেকে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিতে শুরু করল।

* * * * * *

সাত নম্বর সেল নামক যে ঘরটিতে আমাকে আটকে রাখা হল সেটি আগের ঘরটির মতোই আসবাবপত্রহীন এবং নিরানন্দ একটি কুঠুরি। ঘরটির দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে দরজা-জানালাহীন নিশ্ছিদ্র এই ঘরটিকে একটি বদ্ধ খাঁচার মতো এবং নিজেকে আক্ষরিক অর্থে খাঁচায় আটকেপড়া একটি ইঁদুরের মতো মনে হতে থাকে। আমি ঘরের ভিতরে কয়েকবার পায়চারি করে কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এক কোনায় বসে নিজের হাঁটুর উপর মুখ রেখে সিস্টেম এডিফাসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। আমার মনে হতে থাকে আমাকে কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। অপেক্ষা করে করে আমি যখন অধৈর্য হয়ে উঠলাম ঠিক তখন শুনতে পেলাম ভারি গলায় কেউ একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "সিস্টেম এডিফাস তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।"

যে কারণেই হোক, আমার নিজেকে খুব আমন্ত্রিত মনে হল না বলে আমি চুপ করে রইলাম। সিস্টেম এডিফাস আবার বলল, "তুমি নিশ্চয়ই জান যে তোমাকে একটা খুনের মামলার সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে আনা হয়েছে।"

আমার কথা বলার ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু চুপ করে থাকলে যদি পরোক্ষভাবে ঘটনাটির সত্যতা স্বীকার করা হয়ে যায় সেই ভয়ে আমি বললাম, "আমি কিছুই করি নি, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

"তুমি সত্যিই কিছু কর নি কি না সেটা কিছুক্ষণের মাঝেই আমি বের করব।"

"কীভাবে বের করবে?"

"তুমি একটি ফ্যারাডে কেজে রয়েছ। অসংখ্য মনিটর তোমার নিশ্বাস, প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ, মস্তিষ্কের সবগুলি দীর্ঘ লয় এবং স্বল্প লয়, তরঙ্গ, তাপমাত্রা, ত্বকের

জলীয় বাষ্প ইত্যাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখছে। তোমার মুখের প্রতিটি শব্দকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে তুমি সত্যি কথা না মিথ্যা কথা বলছ।"

আমি আশান্বিত হয়ে বললাম, "আমি সত্যি কথা বললে তুমি বুঝতে পারবে?"

"অবশ্যি।"

"তাহলে শোন, আমি পুরোপুরি নির্দোষ।"

আমার সাথে যে কণ্ঠস্বরটি কথোপকথন করছিল সেটি হঠাৎ করে পুরোপুরি নীরব হয়ে গেল। আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "কী হল? তোমার যন্ত্রপাতি কী বলছে? আমি কি সত্যি কথা বলছি?"

"হ্যাঁ। আমার যন্ত্রপাতি বলছে তুমি সত্যি কথা বলছ। তবে—"

"তবে কী?"

"তুমি ঠিক কোন ব্যাপারে নির্দোষ সেটি পরিষ্কার হল না।"

"এই ব্যাপারে, যে ব্যাপারে আমাকে ধরে এনেছ।"

"সেটি কোন ব্যাপার?"

"আমি তো ভালো করে জানিও না। আমি বেঞ্চে বসে খাচ্ছিলাম—"

আমাকে বাধা দিয়ে সিস্টেম এডিফাস বলল, "তুমি কি বলতে চাইছ ঘটনাটি তুমি ভালো করে জানই না?"

"না।"

"যে ঘটনাটি তুমি জানই না সেখানে তুমি দোষী বা নির্দোষ সেটি কেমন করে বলবে?"

আমি সিস্টেম এডিফাসের কথায় হঠাৎ এক ধরনের আতংক অনুভব করলাম। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষ পুরোপুরি অর্থহীন একটা ব্যাপারে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারে, কিন্তু একটি যন্ত্রের সাথে সেটি কি করা সম্ভব? যন্ত্র কি কোনো নিরীহ কথাকে ভুল বুঝতে পারে না? আমি কী বলব ঠিক করার চেষ্টা করছিলাম ঠিক তখন সিস্টেম এডিফাস ভারি গলায় বলল, "আমাদের তথ্য অনুযায়ী তুমি এখন বিভ্রান্ত এবং কিছু একটা কৃত্রিম উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করছ।"

"না, আমি কোনো কৃত্রিম উত্তর তৈরি করছি না। একটা যন্ত্রের সাথে কীভাবে অর্থপূর্ণ কথা বলা যায় সেটি ভেবে বের করার চেষ্টা করছি।"

"বেশ। আমরা তাহলে ঘটনাটি একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। দেশের একজন অত্যন্ত কুখ্যাত মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসায়ী তোমার কোলে মৃত্যুবরণ করেছে। তার দেহে সাতটি রনোগানের ক্ষতচিহ্ন ছিল, তোমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তোমার হাতেও ছিল একটা রনোগান। তোমার সাথে এই দুর্ধর্ষ খুনি মানুষের কত দিনের পরিচয়?"

"তার সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই।"

"তাহলে এত মানুষ থাকতে সে কেন তোমার দিকে ছুটে এল?"

"এটি—এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা! সে যে কোনো মানুষের দিকে ছুটে যেতে পারত।"

সিস্টেম এডিফাস এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, "আমি যখন তোমাকে এই দুর্ধর্ষ খুনিটি নিয়ে প্রশ্ন করেছি তখন তোমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তোমার মস্তিষ্কে একটা মধ্যম লয়ের নিচু তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ কী? তুমি কি সত্য গোপন করেছ?"

আমি চমকে উঠে বললাম, "না, আমি কোনো সত্য গোপন করি নি।"

"এই ভয়ংকর অপরাধী সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যখন প্রথম তাকে দেখেছি

আমার মনে হয়েছে মানুষটির মাঝে একটি শান্ত সমাহিত ভাব আছে। আমি বুঝতেই পারি নি সে এত বড় অপরাধী।"

"বুঝতেই পার নি?"

"না।"

"তার সম্পর্কে তোমার একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল?"

"শ্রদ্ধা কি না জানি না, মানুষটাকে দেখে তার ভিতরে একটা পবিত্রতা ছিল বলে মনে হয়েছিল।"

"এতবড় একজন দুর্ধর্ষ খুনি কিন্তু তাকে দেখে তোমার মনে হল পবিত্র?"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "মানুষের চেহারা সব সময় সত্যি কথা বলে না; এটি নূতন কিছু নয়। পৃথিবীতে অনেক সুদর্শন দুশ্চরিত্র মানুষ রয়েছে।"

"এতবড় একজন অপরাধী তোমার ভিতরে পবিত্র ভাব এনেছে সেজন্যে তোমার ভিতরে কি কোনো অপরাধবোধ আছে?"

"না, অপরাধবোধ নেই। কেন থাকবে?"

"আশ্চর্য!"

"কোন জিনিসটা আশ্চর্য?"

"তোমার মুখের প্রত্যেকটা উক্তির আমি সত্যতা যাচাই করে দেখেছি। তুমি মুখে যেটা বলেছ তার সাথে সত্যতার গরমিল রয়েছে। যেমন মনে কর পবিত্রতার কথা। পবিত্রতা জিনিসটি মূলত ধর্মসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হয়। আমার যে মূল তথ্যকেন্দ্র রয়েছে সেখানে পবিত্রতা কথাটির উনচল্লিশ ধরনের অর্থ রয়েছে—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমরা মানুষ। আমাদের মাঝে অসংখ্য জটিলতা থাকে। আমাদের কথাবার্তা, কাজকর্মকে তুমি এরকম হাস্যকর ছেলেমানুষি একটি সরল রূপ দিতে পার না।"

সিস্টেম এডিফাস এভাবে আমাকে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা জেরা করল। এটি আমাকে খাওয়া, ঘুম বা বিশ্রামের জন্যেও সময় দিল না। তার জেরা শুনে মনে হল সে আমার সম্পর্কে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, আমার সাথে কথা বলে শুধুমাত্র তার সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে যাচ্ছে। আমার কোনো কথা অবিশ্বাস করার প্রয়োজন হলেই সে রক্তচাপ বা মস্তিষ্কের দ্রুত লয়ের কোনো একটি তরঙ্গের নাম বলে যেটি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। অর্থহীন কথায় বিরক্ত হয়ে আমি যদি একটি বেফাঁস উক্তি করে ফেলি তাহলে সেটি নিয়েই দীর্ঘ সময় আমার সাথে তর্ক করতে থাকে। আমি ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে আবিষ্কার করি সে আমার মুখ দিয়েই তার পছন্দসই এক একটি উক্তি বের করে নিচ্ছে। সিস্টেম এডিফাস নামের এই যন্ত্রটির মানুষের নিজস্ব জটিলতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, এটি বাড়াবাড়ি ধরনের নির্বোধ এবং একগুঁয়ে একটি যন্ত্র। কাজেই, আটচল্লিশ ঘণ্টার মাথায় যখন সিস্টেম এডিফাস মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবৈধ ব্যবসায়ীর কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং পরবর্তীকালে তার হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দান করল আমি খুব বেশি অবাক হলাম না।

* * * * * *

আমি সিস্টেম এডিফাসকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কখন আমাকে হত্যা করবে?"

"মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিশ্চিত হওয়ার এক সপ্তাহের মাঝে আমি সেটা কার্যকর করি।"

"এক সপ্তাহ?" আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "মাত্র এক সপ্তাহ?"

"এক সপ্তাহ মাত্র নয়, এটি একটি দীর্ঘ সময়।"

আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। সমস্ত ব্যাপারটিকে এখনো আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়, এটি যেন একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন, আমার শুধু মনে হতে থাকে যে এক্ষুনি আমার ঘুম ভেঙে যাবে আর আমি আবিষ্কার করব আমি আমার ঘরে আমার বিছানায় নিরাপদে শুয়ে আছি।

কিন্তু সেটি ঘটল না, আমি শুনতে পেলাম সিস্টেম এডিফাস বলল, "যদিও তোমার অপরাধটি একটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ কিন্তু তুমি অপরাধটি প্রত্যক্ষভাবে কর নি, শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছ। সে কারণে তোমাকে কীভাবে হত্যা করব সে ব্যাপারে তোমার কোনো একটি সুপারিশ আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি।"

"সুপারিশ? আমার সুপারিশ?"

"হ্যাঁ।"

"কী ধরনের সুপারিশ?"

"যেমন তুমি কীভাবে মৃত্যুবরণ করতে চাও। গুলিবর্ষণ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, বিষপ্রয়োগ, বিষাক্ত ইনজেকশান, বিষাক্ত গ্যাস, উচ্চচাপ, উচ্চতাপ ইত্যাদি।"

আমি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম, যে মানুষকে হত্যা করা হবে তার কাছে পদ্ধতিটির কোনো গুরুত্ব নেই। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, "আমি কি অন্যকিছু সুপারিশ করতে পারি?"

সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "ঠিক আছে কর।"

"তুমি যেহেতু মানুষ নও তাই তুমি হয়তো জান না যে মৃত্যু কখনোই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।"

"কিন্তু তবু তোমাদের গ্রহণ করতে হবে।"

"আমি সে ব্যাপারে তোমার একটু সাহায্য চাইছি।"

"কী সাহায্য?"

"আমার মৃত্যুটি যেন হয় আকস্মিক। আমার অজান্তে সেটি যেন ঘটানো হয়।"

"অজান্তে?"

"হ্যাঁ। তাহলে সেটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে, সেই ভয়াবহ অনুভূতির ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হবে না।"

সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "কিন্তু সেটি তো সম্ভব নয়। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের জন্যে একটা প্রস্তুতি নিতে হয়, সেই প্রস্তুতিটি তোমার অজান্তে করা সম্ভব নয়।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তাহলে অন্ততপক্ষে কবে আমাকে হত্যা করবে সেই দিনটি কি আমার কাছে গোপন রাখতে পারবে?"

"সেই দিনটি?"

"হ্যাঁ। সেই নির্দিষ্ট দিনটি?"

"সেটি করা যেতে পারে।" সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আমি কবে তোমাকে হত্যা করব সেই দিনটি তোমার কাছে গোপন রাখব।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সিস্টেম এডিফাস।"

"একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের জন্যে অন্তত এইটুকু করা আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি যে আমাকে কথা দিয়েছ যে আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিনটি আমার কাছে গোপন রাখবে সেটি কি একটি সত্যিকারের অঙ্গীকার?"

"হ্যাঁ। সেটি একটি সত্যিকারের অঙ্গীকার।"

আমি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "আমি যদি কোনোভাবে সেটা জেনে যাই?"

"তুমি জানবে না।"

"কিন্তু তবু যদি আমি কোনোভাবে জেনে যাই?"

"তুমি নিশ্চিত থাক তুমি কোনোভাবে জানবে না।"

আমি হঠাৎ একটু বেপরোয়ার মতো বললাম, "আমি কি দাবি করতে পারি যে আমি যদি দিনটি জেনে যাই তাহলে সেই দিনটিতে আমাকে হত্যা করতে পারবে না?"

সিস্টেম এডিফাস এক ধরনের যান্ত্রিক হাসির মতো শব্দ করে বলল, "তুমি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছ। কিন্তু যদি তুমি এই প্রতিশ্রুতি থেকে সান্ত্বনা পেতে চাও তাহলে আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে তুমি যদি কোনোভাবে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেবার দিনটি আগে থেকে জেনে যাও তাহলে আমি সেইদিন তোমাকে হত্যা করব না।"

"কবে হত্যা করবে?"

"অন্য কোনো একদিন হত্যা করব।"

"তুমি কথা দিচ্ছ?"

"আমি কথা দিচ্ছি।"

আমি একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এরকম—আজ থেকে সাত দিনের ভিতরে তুমি আমাকে হত্যা করবে। কবে হত্যা করা হবে সেটি আমার কাছে গোপন রাখা হবে, কিন্তু আমি যদি দিনটি আগে থেকে জেনে যাই তাহলে সেই দিনটিতে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না।"

"তুমি ঠিকই বলেছ।"

"এ ব্যাপারে তুমি অঙ্গীকারাবদ্ধ?"

"আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ।"

"যদি তুমি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ কর?"

সিস্টেম এডিফাস যান্ত্রিক এক ধরনের হাসির মতো শব্দ করে বলল, "আমার গঠন সম্পর্কে ধারণা নেই বলে তুমি এই কথা বলছ। আমার অঙ্গীকার প্রকৃতপক্ষে হার্ডওয়ারনির্ভর, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আক্ষরিক অর্থে কয়েক হাজার প্রসেসরকে ধ্বংস করার সমান। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মহত্যা আমার জন্যে সমান।"

"শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। তোমাকে ধন্যবাদ সিস্টেম এডিফাস।"

"ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। মানব সমাজের সেবা করাই আমার উদ্দেশ্য।"

আমি বন্ধঘরটিতে কয়েকবার পায়চারি করে মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি আমাকে হত্যা করার জন্যে সাত দিন সময় নিয়েছ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময়টি ছয় দিন, তাই না?"

"ছয় দিন? কেন?"

"কারণ প্রথম ছয় দিন তুমি যদি আমাকে হত্যা না কর তাহলে আমি বুঝে যাব সপ্তম দিনেই তুমি আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু আমি যদি দিনটি জেনে যাই তাহলে তো তুমি আমাকে আর সেইদিন হত্যা করতে পারবে না। কাজেই আমাকে যদি সত্যি হত্যা করতে চাও তাহলে আমাকে প্রথম ছয় দিনের মাঝেই হত্যা করতে হবে। ঠিক কি না?"

সিস্টেম এডিফাস কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। তোমাকে হত্যা করার জন্যে আমি সাত দিন অপেক্ষা করতে পারব না—প্রথম ছয় দিনেই করতে হবে।"

"তাহলে কি আমরা ধরে নেব আগামী ছয় দিনের মাঝেই আমাকে হত্যা করা হবে?"

"হ্যাঁ ধরে নিতে পার।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "যদিও আমার সময় ছিল সাত দিন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা হয়ে গেল ছয় দিন। আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন থেকে আরো একটা দিন হারিয়ে গেল।"

"তুমি যেভাবে চেয়েছ তাতে আর কিছু করার নেই।"

আমি খানিকক্ষণ ঘরে পায়চারি করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি তো আসলে ষষ্ঠ দিনেও হত্যা করতে পারবে না।"

"কেন?"

"আমি জানি ছয় দিনের মাঝে তুমি আমাকে হত্যা করবে। কাজেই পাঁচ দিন পার হওয়ার পরই আমি বুঝতে পারব পরের দিন আমাকে হত্যা করবে। তাই না?"

সিস্টেম এডিফাস এবার বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়াল। আমি সপ্তম দিনে যেরকম তোমাকে হত্যা করতে পারব না, ষষ্ঠ দিনেও পারব না।"

"না পারবে না।" আমি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "ষষ্ঠ দিনেও যেহেতু পারবে না কাজেই আমাকে পাঁচ দিনের মাঝে মারতে হবে। আমার আয়ু মাত্র পাঁচ দিন।"

সিস্টেম এডিফাস বিচিত্র এক ধরনের গলায় বলল, "পরবর্তী পাঁচ দিনের মাঝে আমার তোমাকে হত্যা করতে হবে। সময়—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

চার দিন পার হবার পর আমি কি জেনে যাব না যে পঞ্চম দিন এসে গেছে? আমার শেষ দিন এসে গেছে! আমি যদি জেনে যাই তাহলে তুমি আমাকে কীভাবে হত্যা করবে? তুমি অন্তত সেদিন হত্যা করতে পারবে না।"

সিস্টেম এডিফাস এবারে কোনো কথা বলল না। আমি তাকে ডাকলাম, "সিস্টেম এডিফাস।"

"বল।"

"তুমি কথা বলছ না কেন? পঞ্চম দিনেও তো তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। তুমি অঙ্গীকার করেছ আমি যদি বুঝে যাই তুমি আমাকে হত্যা করবে না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল চার দিনে।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"চার দিনের বেলাতেও তো এই যুক্তি দেয়া যায়।"

আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিকই বলেছ। তুমি চতুর্থ দিনেও আমাকে হত্যা করতে পারবে না।"

সিস্টেম এডিফাস ধীরে ধীরে বলল, "চতুর্থ দিনেও তোমাকে হত্যা করতে পারব না। তাহলে প্রথম তিন দিনে—"

আমি গলায় উত্তেজনা ঢেলে বললাম, "আসলে একই কারণে তিন দিনেও পারবে না, দ্বিতীয় দিনেও পারবে না। ভেবে দেখ তুমি প্রথম দিনেও পারবে না।"

"পারব না?"

"না। তার মানে তোমার আমাকে এখনই হত্যা করতে হবে।"

"এখনই?"

"হ্যাঁ। সিস্টেম এডিফাস। কিন্তু আমি জেনে গিয়েছি তুমি এখন আমাকে হত্যা করবে।"

"জেনে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ। আমি জেনে গেলে তুমি আমাকে আর হত্যা করতে পারবে না।"

"আমি তোমাকে হত্যা করতে পারব না?"

"না, সিস্টেম এডিফাস। আমাকে যেতে দাও।"

"যেতে দেব?"

আমি গলায় অনাবশ্যক জোর দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। দরজাটা খুলে দাও সিস্টেম এডিফাস।"

কয়েক সেকেন্ড পর সত্যি সত্যি ঘরঘর শব্দ করে দরজা খুলে গেল। আমি স্টেনলেস স্টিলের নিশ্ছিদ্র এই ঘর থেকে বের হয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললাম, "সিস্টেম এডিফাস, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি।"

"তুমি কি জান যে তুমি একটা বিশাল গর্দভ? অকাট মূর্খ? জঞ্জালের ডিপো—নোংরা আবর্জনা? জান?"

"না, জানতাম না।"

"জেনে রাখ।"

* * * * * *

কয়েকদিন পর সংবাদ বুলেটিনে একটা ছোট তথ্য প্রকাশিত হল যেটি পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সেই বুলেটিনে লেখা ছিল—অপরাধী নির্ণয়, বিচার করা এবং শাস্তি প্রদানের জন্যে প্রস্তুত করা সিস্টেম এডিফাস প্রজেক্টটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করতে সমস্যা হওয়ার কারণে পুরো প্রজেক্টটাই বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮